সাক্ষরতা বুলেটিন

২৫৭

পৌষ ১৪২২
ডিসেম্বর ২০১৫

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৫৯ পৌষ ১৪২২ ডিসেম্বর ২০১৫

সূ চি প ত্র

৩ **শফি আহমেদ**
এবারের বিজয় দিবসের অনন্য উদযাপন

৬ **শাওয়াল খান**
মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান : স্বীকৃতি ও সম্মাননা

১১ **শহীদুল্লাহ শরীফ**
শব্দসৈনিক আবুল কাসেম সন্দীপ : স্মৃতিতে ও প্রেরণায়

১৫ **মুহম্মদ হাসান খালেদ**
কৃষিঋণ বিতরণে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ

১৭ **এ এম রাশিদুজ্জামান খান**
মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

২২ **শর্বরী আলোময়ী**
বাঙালির জীবনধারায় মেলার বিবর্তন

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

শ ফি আ হ মে দ

এবারের বিজয় দিবসের অনন্য উদযাপন

২০১৫ সালের বিজয় দিবসে দাঁড়িয়ে যখন ১৯৭১ সালের সেই ঐতিহাসিক বিকেলের কথা স্মরণ করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই গৌরবলগ্ন পেরিয়ে আসার চার দশকেরও বেশি সময়ের দূরত্ব ও ব্যাপ্তিতে আজকের বাংলাদেশের চিত্রটাকে মেলানোর চেষ্টা করি। একটা হা-হুতাশ খুবই শোনা যায় বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনার অনেকাংশই পূরণ করা যায়নি প্রত্যাশিতভাবে; অনেকে আবার ওই চেতনার অবক্ষয় নিয়েও কথা বলে থাকেন। তাঁদের এমন মন্তব্যের বিরোধিতা করার কোন অবকাশ নেই। আবার কিছু বাস্তবতাকে আবশ্যিকভাবেই মান্য করতে হয়। গত শতকের শেষ দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এবং সারা দুনিয়ায় বাজার ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণশীল আধিপত্যের পরও যারা বলতে থাকেন আমাদের এই বাংলাদেশে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করার হাজারো সম্ভাবনার কথা, তারা কতটা যুক্তি দ্বারা চালিত, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

এমন সব মন খারাপ করা বিতর্কের মধ্যে আটকে থাকতে চাই না। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় বলতে পারি ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালের পর এই এবছর বিজয় দিবসে যে উত্তাপ, উত্তেজনা ও দেশানুভূতি দেখেছি, তার তুলনা হয় না। অথচ নানা কারণে সমাজে অস্থিরতা বেড়েছে। রাজনৈতিক কারণে বছরের প্রথম তিন মাস দেশে অযথা হানাহানি হয়েছে, অস্বাভাবিক একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে, নানারকম অনিশ্চয়তার একটা সংকট তৈরি হয়েছিল, আগুনে বোমায় নিহত ও আহতের সংখ্যা আমাদের পীড়িত করেছিল, কিন্তু দেশের মানুষের অসীম ধৈর্যে এবং আন্তরিক অভিনিবেশে দেশ ওই বিপন্ন সময় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। বছরের শেষ দিকে এসে সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচকের নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের এগিয়ে যাবার প্রবণতাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

একটা বড় লজ্জাজনক কলঙ্ক নিয়ে আমরা স্বাধীনতার পর চারটা দশক পার করেছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের কোন বিচার হয়নি স্বাধীন বাংলাদেশে। বিজয় অর্জনের চার বছর পূর্তির আগেই এদেশের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা, এক অনভিপ্রেত ও অকল্পনীয় রক্তাক্ত পরিণতিতে স্বাধীনতার অবিসাংবাদিত মহানায়কের নিহত হবার ঘটনা দেশের সমাজ ও রাজনৈতির পথকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীনতার যে জাতীয়তাবাদী ও সকল মানুষের এক গন্তব্যে পৌঁছানোর ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য ছিল, তা থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম। এ আমাদের এক করুণ পরিণতি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণই যেন এক বড় অপরাধ, এ বিষয়ে সবার মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কয়েকজন বিপথগামী সৈনিকের পরম হঠকারী ও ঘৃণ্য আক্রমণে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। এখন আমরা এই দিবসটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করি।

কিন্তু আশির দশকে পাকিস্তানপন্থী ডানপন্থী গোষ্ঠী এটাকে নাজাত দিবস হিসেবে পালন করার প্রচেষ্টায় তৎপর ছিল। 'জয় বাংলা' নামের যে স্লোগান উর্ধ্বাকাশে ছুঁড়ে দিতে দিতে হাজারো মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন, সেটিও প্রায় এক অলিখিত কিন্তু রক্তচক্ষু নির্দেশনায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। আরো অনেক রকম পরিবর্তন প্রবল গতিতে সমাজের ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক ও চেতনার গতিকে অবরুদ্ধ করেছিল। যে জাতি লাখো শহীদের রক্তদানের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছিল, চার বছর পূর্ণ হবার আগেই তার এমন রক্ত দ্বারা লেখা ইতিহাসে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার গলা টিপে ধরে নেমে এল সামরিক শাসন।

এখনও ১৯৭৫ সালের সেই কম্পমান বিজয় দিবস পালনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমরা অনেকেই শিহরিত বোধ করি। অমন নিষ্ঠুর সময়কে আর মনে করতে চাই না। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বিজয় দিবস উদযাপন বিষয়ে নানা দ্বিধা-সংশয় এবং অনিশ্চয়তা কাজ করবে, সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে তো সন্দেহ নেই। তারপর দেশের রাজনীতিতে আরো নানা পালা-বদল, দীর্ঘকাল ধরে গণতন্ত্র নির্বাসিত থাকলো, দেশে এক যুগেরও অনেক বেশি সময় ধরে সামরিক শাসন বহাল থাকলো; বহু নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে জনগণকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে হয়। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যেন নানাভাবে প্রতারিত হতে লাগল।

ইতোমধ্যেই দেশের সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের মেরুকরণকে স্পষ্ট করার একটা পরিকল্পনা ছিল শাসকগোষ্ঠীর, কিন্তু একই সঙ্গে দেশীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থাকে প্রবেশ করানোর একটা প্রবল অভিপ্রায়ও ছিল। পাকিস্তানী আমলে, বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্য ও নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণ করা হবে, সে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার যে প্রধান স্তম্ভ সংবিধানে ছিল, এদেশের প্রথম সামরিক প্রশাসক কোনরকম সংসদীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে তা ধূলিসাৎ করে দিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় এমন বিবিধ কাণ্ডকারখানা, স্বাধীনতাবিরোধী শিবিরভুক্ত মানুষের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা বিজয় দিবস উদযাপনকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। উদারপন্থী মানুষের মনে এবং মননে সেই শঙ্কা প্রসারিত হয়ে যায়। স্বাধীনতার শত্রু-মিত্রদের মধ্যে আড়ালে-আবডালে দৃশ্য-অদৃশ্য নানা চরিত্রের মৈত্রী গড়ে উঠতে থাকে। সত্যি এ এক অনিশ্চিত সময়।

তারপর ১৯৯০ সালে দীর্ঘ আন্দোলনের পর এদেশে স্বৈরাচারের পতন ঘটল। কিন্তু ইতোমধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-হারানো সংবিধানে আর এক বিষয় সংযোজন ঘটিয়েছেন দ্বিতীয় সামরিক প্রশাসক। বৈষম্যকে আরো পাকাপোক্তভাবে কায়েমী করে তোলার পরিকল্পনায় এই মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' বলে আর একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি সংবিধানকে কলঙ্কিত করেছে। এবং সংবিধান তো শুধু কোন কাগুজে দলিল নয়। এটাও তো রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের শেষে অর্জিত বিজয়ের সবচেয়ে পবিত্র ও গৌরবময় ফসল। 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে বিশেষ ধর্মের অন্তর্ভুক্তি কখনও কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কোন পর্যায়ে দাবি করা হয়নি, তবুও এক অশুভ প্রক্রিয়ায় তা করা হল। বুক ভেঙে গেল ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকূলের, সংশয়ে নির্বাক দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী। উদারপন্থী শিক্ষিত মানুষ এর প্রতিবাদ করলেন, নানা যুক্তির প্রক্ষেপণে শাণিত রচনা প্রকাশিত হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

কিন্তু সেই অপূরণযোগ্য ক্ষতি তো সাধিত হয়েই গেল। দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রধর্ম বিষয়টির সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে তখন প্রতিবাদ করলেও, এমন বোধ সবার মধ্যেই প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে, এর দ্বারা সুকৌশলে যে সমাজপ্রবণতাকে উস্কে দেয়া হয়েছে, তা থেকে জাতির পরিত্রাণ নেই। তবুও ১৯৯০ সালের সামরিক স্বৈরাচার থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। মনে হয়েছিল, আর একটু বাড়তি অক্সিজেন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বিজয় দিবস উদযাপন করতে পারবে। হ্যাঁ, সত্যিই আলাদা এক ধরনের মুক্তির স্বাদ পাওয়া গেছে তারপরের বিজয় উৎসবে। তবুও আমাদের সেই আদি নিখাদ অনুভব যেন হারিয়ে গেছে। ভোটাভুটির ফলাফল এমন হল যে, দেশের শাসনক্ষমতায় বসার জন্য শাসক দলকে সমর্থন নিতে হল স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির। এমনটাও লেখা ছিল বাঙালি জাতির কপালে! অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া বাংলাদেশের ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস।

স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পুনরার্বিভাব আমাদের বিস্মিত ও হতাশ করে তোলে। পাকিস্তানপন্থীদের কণ্ঠস্বর দিন দিন উচ্চকিত হয়ে উঠতে লাগলো এই স্বাধীন বাংলাদেশে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হল 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'। স্বাধীনতার একটি সেক্টরের কমাণ্ডার, যিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন, তার নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় থাকার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করার এক জঘন্য রাজনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ করলো।

উদারপন্থী, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি দেশের নানা জায়গায় সংগঠিত হয়ে 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'-র কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যোগ দিতে লাগলো। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার লক্ষ্যে এই কমিটির উদ্যোগে গঠিত হল গণ-আদালত। দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রণী অংশ গণআদালত অনুষ্ঠানে সায় দিলেন এবং যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল, সেখানেই গণআদালতের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিজ্ঞ বিচারক রায় ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা-বিরোধীদের মধ্যমণি রাজাকারশ্রেষ্ঠ গোলাম আযমের অপরাধের জন্য ফাঁসির দণ্ডই প্রাপ্য।

১৯৯০ সালে যে গণআন্দোলনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ফিরে

এসেছিল, তারই সূত্রে গঠিত জনগণের ভোটাধিকারে নির্বাচিত সরকার গণআদালত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করলো, বিচারকদের কাঠগড়ায় তাদের হাজির হতে বাধ্য করা হলো। কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি যদিওবা, তথাপি স্মরণ করতে গিয়ে যন্ত্রণার্ত বোধ করছি যে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় খালাম্মা শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তবুও সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করেনি।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের কুষ্ঠিঠিকুজির এই বিবরণ এজন্যই প্রয়োজনীয় ছিল যে, এবারের এই ২০১৫ সালের বিজয় দিবসের উদযাপনে ঢাকায়, অন্যান্য শহরে ও দেশের সর্বত্র যে উত্তেজনা ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের উত্তাপ লক্ষ করা গেছে, তা শুধু তুলনীয় শুধু ১৯৭২ সালের সঙ্গে। দক্ষিণপন্থীরা ভেবেছিল এদেশে আর পাকিস্তানপন্থার বিরোধী জনমত ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়ে উঠবে না। কিন্তু তা নয়। চল্লিশ বছরেরও অধিক কাল পরে এই দেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল।

তবুও মানুষের মধ্যে সংশয় ছিল, সত্যিই কি বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে, শুরু হলেও তা কি চলমান থাকবে, না কি চালু রাখার মধ্য দিয়ে কালক্ষেপণ করার প্রচেষ্টা থাকবে, যদি কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে রায় হয়, তা কি কার্যকর করা যাবে? বিগত তিন দশকেরও বেশি কাল জুড়ে যুদ্ধাপরাধীরা বিপুল শক্তি সংহত করেছে। দুই আমলের সামরিক শাসনামলে পাকিস্তানপন্থীরা বিভিন্নভাবে তাদের অবস্থানকে দেশের সমাজ-সংগঠনের গভীরে নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় সফল হয়েছে। মাদ্রাসা স্থাপন করে, মাদ্রাসায় তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তা ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। স্বাস্থ্য সেবার নামে ক্লিনিক স্থাপন, শিক্ষার নামে স্কুল স্থাপন থেকে শুরু করে অষুধ শিল্প, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক-বীমার মত আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুলে তারা কর্মী নিয়োগ দিয়েছে; দেশের মধ্যে ধর্মকে ভিত্তি করে জনগণকে বিভক্ত করেছে, সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার করেছে। এভাবেই এগিয়েছে তারা।

সেই সুযোগে নানান নামের ইসলামী জঙ্গী সংগঠন শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তাদের সহায়তায় এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় এইসব জঙ্গী গোষ্ঠী তাদের আধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। যশোরে উদীচীর সম্মেলন এবং রমনার বটমূলে ছায়ানটের প্রভাতী বৈশাখী অনুষ্ঠানে মানুষ হত্যা করে তারা তাদের শক্তির মাত্রা জানিয়ে দেয়। তারপর সরকার নড়েচড়ে বসলেও স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপন্থীদের ছত্রছায়ায় তাদের শক্তিবৃদ্ধি চলতেই থাকে।

এমন পরিস্থিতিতে, দেশীয় এমন পরিপ্রেক্ষিতের বিপরীতে সন্ত্রাসীদের পক্ষে যখন কোন কোন আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে সহায়তা যুক্ত হয়েছে, তখন এতদিন পর বাংলাদেশের জনগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোন কার্যকর পরিণতি দেখতে পাবে কি না স্বাভাবিকভাবে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। সরকারি গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন স্বাধীনতার গৌরবগাথাকে সংকুচিত করে দেখানো হয়েছে; স্কুল-পাঠ্য বইগুলিতে ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়ে একালের কিশোর-তরুণদের সেই ১৯৭১ সাল সম্পর্কে ভ্রান্ত ও হ্রস্ব চরিত্রের শিক্ষাদান করা হয়েছে; মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ আর বেঁচে নেই এবং কিছু অংশকে নানান আর্থিক ও রাজনৈতিক টোপ দিয়ে বেপথু করা হয়েছে এবং অতীত ভুলে সামনে তাকানোর একটা পরিকল্পনা এগিয়ে নেবার যাবতীয় ব্যবস্থা যখন গ্রহণ করা হয়েছে, তখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে শক্তি প্রদানের সম্ভাবনা বিষয়ে তো মানুষের মধ্যে সত্যিই সন্দেহ জাগে।

কিন্তু, দীর্ঘ তদন্তকাজ শেষে, দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পরিণতিতে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সত্যিই যুদ্ধাপরাধের বিপক্ষে রায় হল। কোথায় লুকানো ছিল এমন স্বদেশচেতনা! বাঙালি জাগলো, মুক্তিযোদ্ধারা আবার সম্মিলিত হলেন। একটি রায়ের দণ্ডে জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করলো। তরুণরা ঘরবাড়ি ছেড়ে, ছাত্র-ছাত্রীরা হল ছেড়ে এসে জমায়েত হলো শাহবাগে। প্রৌঢ়রা এলেন, বৃদ্ধরাও যোগ দিলেন, অন্দরমহলের নারী নেমে এলেন পথে।

আক্ষরিক অর্থেই গণজাগরণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হল। ঢাকায় ও অন্যান্য বিভিন্ন শহরে, উপজেলায় পর্যন্ত। লাখো কণ্ঠ তখন গগনবিদারী কণ্ঠে ফিরিয়ে এনেছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সেই মন্ত্রবাণী-'জয় বাংলা'। একাত্তরের পরে বাংলাদেশে এমন চিত্র এর আগে দেখা যায়নি। তরুণরা নতুন করে ইতিহাসের পাঠ নিল, শিশুরা আবার শিখতে লাগলো স্বাধীনতার সত্য-ইতিহাস, স্বাধীন বাংলা বেতারের গান ফিরে এলো নতুন প্রজন্মের কাছে, আনন্দের অশ্রু দেখালাম শহীদকন্যার চোখে, তা স্পর্শ করলো সারা জাতিকে।

এভাবেই এগোনোর পথ সৃষ্টি হলো, এভাবেই ফিরে চলা মাটির টানে, এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ পরিশোধের প্রত্যয় ধ্বনিত হল এবারের অনুপম বিজয় দিবসে।

শফি আহমেদ
সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার
পি-কে-এস-এফ

শাওয়াল খান

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান:স্বীকৃতি ও সম্মাননা

আমি এখন মুক্তিযোদ্ধা মায়ের সন্তান, মিলিটারির নই -সুমনা খাতুন।

দীর্ঘ ৪৪ বছর বয়ে বেড়ানো দীর্ঘশ্বাসটা এভাবেই ছাড়লেন দেশবাসীর উদ্দেশে, কুষ্টিয়ার দয়রামপুরের দুলজান নেছার যুদ্ধশিশু সুমনা খাতংন। সুমনা খাতুনের দুনিয়াটা এখন একটু অন্যরকম, কারণ একটাই- দীর্ঘদিন পর মায়ের 'মুক্তিযোদ্ধা' স্বীকৃতি অর্জন। এই একটা স্বীকৃতি আরো ৪০ জন দুলজান নেছা এবং অগণিত সুমনা খাতুনকে বসিয়েছে সম্মানের আসনে। তাই তো সুমনা সেদিন সেলফোনে সাংবাদিকের নাগাল পেয়ে একটানে বলে গেলেন, 'সারাজীবন অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছে। এমনকি বিয়ের পর আমাকে 'মিলিটারির মেয়ে' বলে গালি দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আর মাকে তো সেই ছোটবেলা থেকে লোকে ঘেন্না করেছে। আজ মনে হচ্ছে আমাদের কষ্টের দিন শেষ হলো, অনেক দুঃখের পর সুখ এল!'

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এমন ৪১ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছেন। এর আগে ১২ অক্টোবর ২০১৫, প্রথম দফায় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এবার উপজেলা পর্যায়ে ১২১ টি আবেদন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে জমা পড়ে। যাচাই-বাছাইয়ের পর ৫৪টি আবেদন জামুকার ৩৩তম বৈঠকে উপস্থাপন করা হয় এবং ৪১ জনকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মান জানিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁদের পুনর্বাসনেরও ঘোষণা দিয়েছিলেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এ ব্যাপারে রুল জারি করেন এবং বীরাঙ্গনাদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের একটি বড় অংশ ছিল গ্রামাঞ্চলের। ফলে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার রক্ষণশীল বাস্তবতায় কঠিন সময় পার করতে হয়েছে এসব নারী যোদ্ধাদের। সরকার এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক গণমাধ্যমকে বলেন, এ স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো নারীদের ত্যাগের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলল। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মতো এখন তাঁরাও ভাতাসহ পূর্ণ সুযোগ

সুবিধা পাবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের হাতে সম্মানী ভাতা তুলে দেবেন। কেউ মারা গিয়ে থাকলে তাঁর সন্তানরা স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমানে মাসিক যে ভাতা পান, নারী মুক্তিযোদ্ধারাও সমান ভাতা পাবেন। তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের চাকরির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ কোটা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও বিনামূল্যে পড়ালেখার সুযোগ পাবেন।

স্বীকৃতি পেতে যাওয়া ৪১ নারী মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে চারজন কুষ্টিয়ার এলেজান নেছা, দুলজান নেছা, মোমেনা খাতুন ও মাছুদা খাতুন। এই চারজনই শহীদ জননী জাহানারা ইমামের গণ-আদালতে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

সিরাজগঞ্জের দুই নারী- আছিয়া খাতুন ও জোসনা বানু- কেউই বেঁচে নেই। তাঁদের খুঁজে বের করেছিলেন উত্তরণ মহিলা সংস্থা নামের একটি সংগঠন। সংগঠনের পরিচালক সাফেনা লোহানি জানান, বীরাঙ্গনা জানার পর আছিয়া খাতুনের স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। আর জোসনা বানু বিয়েই করেননি।

যশোরের দুই নারী মোমেনা খাতুন এবং রহিমা খাতুনও পেয়েছেন নারী মুক্তিযোদ্ধার সম্মান। আরও যাঁরা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাচ্ছেন, তাঁরা হলেন, নড়াইলের নিগার সুলতানা, বাগেরহাটের আনোয়ারা খাতুন, বরগুনার সিতারা বেগম, সাতক্ষীরার সাবিত্রী চক্রবর্তী, ছফুরা খাতুন, তারা বিবি, মোছাঃ সোনা, বরিশালের কহিনুর বেগম, চুয়াডাঙ্গার শকুরন নেছা, কুমিল্লার বেলারানী দাস, সিলেটের জোসনা বেগম, লাইলী, নমিতারানী দাস, গোপালগঞ্জের রিভা বেগম, লাইলী বেগম, সালেহা বেগম, হীরামণি সাঁওতাল, সালেহা বেগম, হবিগঞ্জের হীরামণি সাঁওতাল, সাবিত্রী নায়েক, শেরপুরের আয়শা খাতুন, সরফুলী বেগম, বিবি হাওয়া, হাফিজা বেওয়া, জাবেদা বেওয়া, আসিরণ বেওয়া, সমলা বেওয়া, হাসেনা বেওয়া, ঢাকার আমেনা বেগম, শেখ ফিরোজা বেগম, ফাতেমা আলী, ছাপাতন বেওয়া, রাজকুমারী রবিদাস ফুলমতি।

মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু শুধু দেশে নয় বিদেশেও ছিল এখন আছে/এদের মধ্যে নারী ও সহযোগী সংস্থার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ সরকার বিশিষ্ট সহযোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মাননা অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা দিয়েছে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে। বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা যাদের দেয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতের গৌরী আয়ুব, মৈত্রেয়ী দেবী, ত্রিপুরার রাজমাতা বিধুকুমারী দেবী, রওশন আরা সাংমা, শাবানা আজমী, ওয়াহিদা রহমান, লতা মুঙ্গেশকর, শর্মিলা ঠাকুর, নার্গিস দত্ত, নন্দিনী সৎপথী, ইলামিত্র, সুচিত্রা মিত্র, রেণু চক্রবর্তী, নিবেদিতা নাগ, মৃন্ময়ী বেগম, মিরা দে, আশরাফী বেগম, শাম্মী হোসেন, পাকিস্তানের নাসিম আখতার ও তাহেরা মাজহার মালী এবং জার্মানির বারবারা দাশগুপ্ত, আয়ারল্যাণ্ডের নোরা শরীফ এবং হান্না পাপানেক, আন্না ব্রাউন টেইলর, মার্গারেট রোজ, জুলিয়া ফ্রান্সিস প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লণ্ডনস্থ প্রবাসী বাঙালি মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানান। বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার সপক্ষে সভা সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কিছু উৎসাহী নেতা ও কর্মী, বিলাত প্রবাসী লেখক, কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীকে সংগঠিত করে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমাদের মানচিত্র, আমাদের জাতীয় পতাকা, আমাদের সার্বভৌমত্ব সব কিছুই মুক্তিযুদ্ধের অর্জন। এ অর্জনে মিশে আছে আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধার অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের ফসল। নারীসমাজ ছিল সেই মহামূল্যবান ফসল বোনার সূক্ষ্ম কারিগর।

২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস বিরতিহীন যুদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ কলস হাতে অথবা অন্য কোনোভাবে অবদান রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নারীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে বড় ধরনের বা উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রামাণিক দলিল ১৫ খন্ডের প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*। ১৫ খন্ডের দলিলপত্রের অষ্টম খন্ডে সংক্ষিপ্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, এখানেও নারী উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি। নারী পায়নি মুক্তিযুদ্ধের উপযুক্ত সুফলও। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানকে মূল্যায়ন করা হয় স্বামী-হারানো স্ত্রী, ছেলে-হারানো মা, ভাই-হারানো বোন, বাবা-হারানো মেয়ে এবং নির্যাতিত নারী হিসেবে। কিন্তু বাস্তবে নারীদের ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক। কাল পরিক্রমায় সেসব ইতিহাসে স্থান করে নেবে। নারী পাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের/অবদানের উপযুক্ত স্বীকৃতি এবং তা হয়েছেও।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে, শুরু করে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহ গণহত্যা। কিন্তু বাঙালিরা চুপ করে বসে না থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাত্রি থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং

এইভাবে প্রথম মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। আক্রমণ ও পাল্টা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সকল বাঙালি সশস্ত্র সেনা, কৃষক, যুবক-যুবতী এবং ছাত্র জনতার সম্মিলিত ঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধের এমনি মুহূর্তে ২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা বাঙালির সংগ্রামকে উজ্জীবিত ও বেগবান করে।

১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এই সরকার ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর থানার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। একই অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। যার মধ্যে নিয়মিত সৈনিক ছাড়াও ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানার শ্রমিক, কৃষক, গৃহিণী, যুবক-যুবতীসহ সকল স্তরের নারী-পুরুষ যাদের নিয়ে গঠিত অনিয়মিত বাহিনী।

সরকারি পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা: ক) নিয়মিত সেনাবাহিনী ও খ) গণবাহিনী। নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে। সরকারি পর্যায়ে যাদের নামকরণ করা হয় এম.এফ (মুক্তিফৌজ)। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তারা কখনও সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা ও প্রতিহত করত। আবার কখনওবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে দখলদার পাকবাহিনীর রক্ষণ ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কমান্ডো তৎপরতা চালিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসত।

গণবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে চাকুরে, কালে শ্রেণীর লোক, কৃষক ও শ্রমিক, এক কথায় দেশের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গণবাহিনীর সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। আনুমানিক বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় এক লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করে। প্রবাসী সরকার প্রশাসনিকভাবে চারজন অফিসারকে চারটি অঞ্চলের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে এক থেকে দশ পর্যন্ত দশটি সেক্টরে বিভক্ত করে নয়জন সেক্টর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরে ১১ নম্বর সেক্টরও গঠিত হয় এবং প্রতিটি সেক্টর কতকগুলি সাব সেক্টরে (১ নং সেক্টরে ৫টি, ২ নং সেক্টরে ৮টি, ৩ নং সেক্টরে ৯টি, ৪ নং সেক্টরে ৬ টি, ৫ নং সেক্টরে ৭টি, ৬ নং সেক্টরে ৬ টি, ৭ নং সেক্টরে ৭টি, ৮ নং সেক্টরে ৮টি, ৯ নং সেক্টরে ৭টি, ১১ নং সেক্টরে ৮টি সাব সেক্টর) বিভক্ত ছিল।

শহরে, গ্রামে যে যে অবস্থানে যে অবস্থায় ছিল, সেখানেই সে অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, কেউ রান্না করে খাবার সরবরাহ করেছেন, কেউ সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, কেউ চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন, কেউ অস্ত্র সামলিয়ে সহযোগিতা করেছেন, কেউ জোগান দিয়েছেন তথ্য, কেউ ব্রতী হয়েছেন জনমত সংগঠনে, কেউ বা দিয়েছেন প্রেরণা। একটি যুদ্ধকে সফল করার জন্য এসবের কোনোটাই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এসব ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে নারীরা অস্ত্র ধরতেও পিছপা হননি। অনেক নারী ফাস্ট এইড ট্রেনিংসহ অস্ত্র চালনা ট্রেনিংও নেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে নারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এদেশের নারীসমাজ অস্ত্র প্রশিক্ষণ (বন্দুক, রাইফেল চালানো, ব্যারিকেড তৈরি, লাঠি চালানো, গ্রেনেড ছোঁড়া) ও আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে, পাহাড়ঘেরা নির্জন জায়গায়, কোনো বড় বাড়িতে এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর, প্রাক্তন পুলিশ সুপার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ নারীরা এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

মার্চ ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাতে ছেলেদের পাশাপাশি সচেতন ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। তার প্রমাণ মেলে কাঠের বন্দুক হাতে সেই তরুণী ছাত্রীদের মিছিলের খন্ড ছবি যা পরবর্তী কালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ ছবিতে যারা ছিলেন তারা হলেন- ডঃ নেলী, তাজ বেগম, নাজনীন সুলতানা, শামীম আরা, রোকেয়া কবির, তাজিম, কামরুন্নেসা খানম প্রমুখ।

রোকেয়া খানম (কমান্ডার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও রোকেয়া সুলতানা রাকা (ডেপুটি কমান্ডার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রীদের নিয়ে প্রথম সশস্ত্র ব্রিগেড তৈরি করেন-যাদেরকে রাইফেল চালনা, শরীর চর্চা, ব্যারিকেড তৈরি ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেয়া হয়। তারা ঢাকার কলাবাগান, রাজাবাজার, ধানমন্ডি, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পুরানা পল্টন, গেন্ডারিয়া, সিদ্ধেশ্বরী ও মগবাজার এলাকায় এই ব্রিগেড তৈরি করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেগম সাজেদা চৌধুরীর (মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী) উদ্যোগে ইন্দিরা রোডের মরিচা হাউসে মেয়েদেরকে সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হয়। ট্রেনিং-এ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন বেগম তাইবুন নেসা রশীদ। রাইফেল ট্রেনিং ছাড়াও মেয়েদেরকে ফাস্ট এইড ট্রেনিংও দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশ নেন তৎকালীন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী রাফিয়া আখতার ডলি, মমতাজ বেগম, রাশেদা আমিন, মমতাজ শেফালী, আয়েশা

খানম (সহ-সভানেত্রী, রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ), রীনা খান, মুনিরা আক্তার, কাজী রোকেয়া সুলতানা, নাসিমুন আরা মিনু, রোকেয়া বেগম, হোসনে আরা, নাজমুন আরা নিনু, নেলী চৌধুরী (ছাত্রী, মেডিকেল কলেজ, ঢাকা), রোকেয়া খাতুন রেখা, রাখীদাস পুরকায়স্থ (সাহিত্য সম্পাদিকা-ছাত্রী সংসদ, ইডেন কলেজ), নাসিমুন আরা নিনি, সালেহা বেগম, মমতাজ বেগম, সালমা বেগম, সুরাইয়া আক্তারসহ আরও অনেকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে ছুটে আসা কমান্ডার লুৎফর রহমান অরুণ ছাত্রীদের গোপন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। তারা রাইফেল চালানোসহ যুদ্ধ ফিল্ডে সেবামূলক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন।

প্রতিরোধ সংগ্রামে নারী: একটি উদাহরণ

শিরিন বানু মিতিল ১৯৭১ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে পাকিস্তানী বাহিনী পাবনা শহরে প্রবেশ করে কার্ফু জারি করে, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার শুরু করার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাতে থাকলে পাবনা জেলা প্রশাসন পাল্টা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ২৭ মার্চ রাতে পুলিশ লাইনে যুদ্ধ শুরু হয় সে যুদ্ধ পুলিশ ও মিলিটারীতে আবদ্ধ না থেকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে মেয়েরাও ঘরে ঘরে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় পুলিশ জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেয়া হয়। ২৬ মার্চের পূর্বেই তিনি প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, থ্রি নট থ্রি চালানো শেখেন। মিতিল সরাসরি প্রতিরোধ সংগ্রামে যুক্ত হন। বীরকন্যা প্রীতিলতাকে স্মরণ করে প্যান্ট-শার্ট পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ২৮ মার্চ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলরত ৩৬ জন পাকসেনার সাথে জনতার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে জনতার সাথে তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী। এই যুদ্ধে ৩৬ জন পাকসেনা নিহত এবং শিরিন বানুর দলে ২ জন শহীদ হন। এভাবে খন্ড খন্ড যুদ্ধ চলার পর ৩০ মার্চ পাবনা শহর স্বাধীন হয়।

৩১ মার্চ পাবনায় পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে যে কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় সেখানে তিনি ছদ্মবেশে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত কাজ করেন এবং এসব কাজ মেয়ে হিসেবে করার উপায় ছিল না বলে তিনি ছদ্মবেশ অবলম্বন করতে বাধ্য হন। এক পর্যায়ে ভারতীয় একজন সাংবাদিকের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তার ছবিসহ সাক্ষাৎকার স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপানো হলে তা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এক ধরনের চেতনা জাগ্রত করার পক্ষে সহায়ক হয়, অপরদিকে ছেলের বেশে সশস্ত্র যুদ্ধ করার সুযোগ তিনি হারিয়ে ফেলেন। ফলে ২০ এপ্রিল তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৭১ সালে কলকাতার গোবরা এলাকায় বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত একমাত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরী এই ক্যাম্প পরিচালনা করেন। এই ক্যাম্পে সর্বমোট ৪০০ নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল নারী রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন, তারা সেখানে ব্যক্তিগত গেরিলা বাহিনীর সদস্য বা সাব-সেক্টর কমান্ডারের অধীনে, নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অধীনে থেকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর তারা বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে সরাসরি রণাঙ্গণে অস্ত্রহাতে গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রু সেনাদের গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। বরিশালের করুণা বেগম, শোভারাণী, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সাহানা, শোভা, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, পটুয়াখালির মনোয়ারা বেগম, যশোরের সালেহা বেগম, সুনামগঞ্জের পেয়ারা চাঁদ, কুঁড়িগ্রামের তারামন বিবি, নারায়ণগঞ্জের ফোরকান বেগমসহ আরো অনেক নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরুষদের পাশাপাশি সম্মুখ সমরে অস্ত্র চালিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে তারামন বিবি অন্যতম। পরবর্তী কালে এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বীর প্রতীকে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী সমাজের একটা বিরাট অংশ রণাঙ্গনে গোলাবারুদ বহন, বন্দুক পরিষ্কার থেকে শুরু করে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কারে বাঙ্কারে খাদ্য ও গুলি পৌঁছে দিয়ে রণাঙ্গনে পুরুষ সহযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। যেমন ত্রিপুরার কাঁকন বিবি। কথিত আছে, তিনি মহব্বতপুর, নূরপুর এবং দোয়ারা বাজারসহ ২০ টির মত সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়ও ছিল সম্মুখ যুদ্ধের মত গুরুত্বপূর্ণ। হাজারো অসুবিধার মধ্যেও অনেক নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু পাকসেনা নয়, আলবদর রাজাকারদের হাত থেকেও রক্ষা করেছেন। যেমন- চট্টগ্রামের দিলারা ইসলাম, হাজেরা খাতুন, আয়েশা হায়দার, পাবনার দীপ্তি লোহানী, টাঙ্গাইলের রহিতুন, যশোরের লিলি হাই, ভোলার রিজিয়া বেগমসহ আরো অনেক নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা দলের খাওয়া-দাওয়া এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনেক নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করে অস্ত্র সংরক্ষণ, বহন (গোপনে), ও সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করে সহযোদ্ধাদের সাহস ও উদ্দীপনা যোগান। এদের মধ্যে আছিয়া

খাতুন, শহীদজননী জাহানারা ইমাম, মাহফুজা খানম, আসমা আলম, রওশন জাহান সাথী এবং হাজেরা খাতুনের নাম উল্লেখ যোগ্য।

মুক্তিযোদ্ধারা যখন দেশের অভ্যন্তরে শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন তখন তাদের খাবার-দাবার যোগাড়-যন্তর করা বা রান্না-বান্না করার সময় থাকতো না। অথচ তখন নিরাপদ খাবার খাওয়া খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের অনেক নারী নিজ উদ্যোগে এগিয়ে এসে প্রতিনিয়ত পাকসেনা, রাজাকার, আলবদরের হুমকি সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করে খাওয়াতেন, খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নবাবগঞ্জের আলেয়া বেগম, গোপালগঞ্জের আনোয়ারা বেগম, চট্টগ্রামের বেগম মুশতারী শফীসহ আরো অনেকে।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকসেনাদের উপর অতর্কিত অক্রমণ চালিয়ে পরাজিত করার লক্ষ্যে ও তাদের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য পাকসেনাদের অবস্থানের খবর, গোপন আস্তানার খবর, তাদের পরিকল্পনা, ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সংখ্যা ইত্যাদি জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- পিউ, মীরা, আর্জু, ঊর্মি, সালমা এবং রোকেয়াসহ আরো অনেকে।

মুক্তিযোদ্ধারা যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন তাদের জন্য প্রচুর অর্থ, বস্ত্র, ঔষধ ও খাবার দাবারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক সচেতন নারী নিজ উদ্যোগে এগিয়ে এসে পরিচিত ও বিশ্বস্ত মহল থেকে এসব সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তা পৌঁছে দেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের উপর যে বর্বরতম গণহত্যা, চালাতে থাকে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্যতম অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার স্বার্থে, দেশের স্বার্থে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে জনমত সংগঠন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এসময় দেশী-বিদেশী মহিলা সংগঠন বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে জনমত সংগঠন করতে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করতে, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে, এদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের মনে আশার আলো জাগাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কেন্দ্র থেকেও পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও তাঁদের কণ্ঠ থেকে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হন। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন বেগম মুশতারী শফী, সানজিদা খাতুন, শেফালী ঘোষ, সুমিতা দেবী, নমিতা ঘোষ, লায়লা হাসানসহ আরো অনেকে।

মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারী নিহত হয়েছেন। তবে সরকারিভাবে এর কোন তালিকা আমরা দেখিনা কোথাও। কিন্তু শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় পাওয়া একজনের নাম সেলিনা পারভীন। আরেকজনের নাম কবি মেহেরুন্নেছা।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মেঘালয়ের এমপি রানী মঞ্জুলা দেবী, বৃটেনের এ্যালেন কনেট, লতা মুঙ্গেশকর, শর্মিলা ঠাকুর, নার্গিস দত্ত, শাপলা আজমী এবং আরো অনেক নারী সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। স্বাধীনতার দীর্ঘ চার দশক পর বাংলাদেশ সরকার বিশিষ্ট সহযোগীদের মধ্যে সম্মাননা প্রদান করেন।

নারী মুক্তিযোদ্ধার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

বর্তমান সরকার ১২ অক্টোবর ২০১৫ প্রথম দফায় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অতি সম্প্রতি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৩৩তম বৈঠকে ৪১ জন নারী মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবছর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সরকার নারী যোদ্ধাদের স্বীকৃতি ও সম্মানিত করতে যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে, দেশগড়ার ইতিহাস বলে, জাতীয় পতাকার ইতিহাস বলে, মানচিত্রের ইতিহাস বলে বিজয়ের এই হাসিতে নারীরও আছে অবদান।

দোহাই:

১. শাহনাজ পারভিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭

২. জেবউননেছা সম্পাদিত, *আলোকিত নারীদের স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ*, প্রাপ্ত প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১২

৩. ফরিদা আক্তার সম্পাদিত, *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৪. বেগম মুশতারী শফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা-প্রথম প্রকাশ-১৯৯২

৫. বেগম মুশতালী শফী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, প্রিয়ম প্রকাশনী, ঢাকা-প্রথম প্রকাশ-১৯৯২

৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা

৭. *আলোকিত বাংলাদেশ* ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা

শাওয়াল খান

লেখক ও গবেষক

শ হী দু ল্লা হ শ রী ফ

শব্দসৈনিক আবুল কাসেম সন্দ্বীপ:স্মৃতিতে ও প্রেরণায়

একাত্তরের একজন বিজয়ী বীর মুক্তিসেনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কর্মময় জীবনের বিভিন্ন স্মরণীয় মুহূর্তগুলোতে, প্রসঙ্গক্রমে, তাঁর কথা মনে পড়ে বারবার । এটা ঠিক বছরের অনেকটা সময় কখনো স্মরণ করি, কখনো ভুলে থাকি তাঁকে, সেই কর্মব্যস্ততারই অজুহাতে। কিন্তু বিজয়ের মাস ডিসেম্বর এলে, স্বাধীনতার মাস মার্চ ফিরলে, আমি সেই মুক্তিসেনার কথা আর ভুলে থাকতে পারি না। তাঁর কথা থরে-বিথরে উঠে আসতে থাকে, ভেসে আসতে থাকে স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে। আজো কেমন যেন শুনতে পাই, তাঁর ঋজুকণ্ঠের বাণী যেটি তিনি দিয়েছিলেন প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে- যদিও তা শোনা সম্ভব নয় ১৯৯৪তে এসে, কিন্তু বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার কালে তিনি যখন সেই একই কণ্ঠে পাঠ করেন স্বাধীনতার ঘোষণাভিত্তিক সংবাদ, যা কোনো ক্রমেই সাধারণ গতানুগতিক ধরনের কণ্ঠের সংবাদ নয়, দেশপ্রেমের আবেগে, স্বাধীনতার ঘোষণাকে ধারণ করে দৈবশক্তি ও তেজস্বিতায় ভাস্বর। সেই বাণী শোনার সৌভাগ্য ঘটে, আজও শুনি, ডিসেম্বর এলে।

তিনি ছিলেন আমার কর্মজীবনের প্রথম চাকুরির নিয়োগ-নির্বাচক মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান। তাঁর হাত ধরে আমার হাতেখড়ি কর্মজীবনের শিক্ষা-উন্নয়ন ভাবনার এবং উন্নত ও অগ্রসর চিন্তারও। সদ্য স্নাতকোত্তর পাশ নব্বইয়ের শুরুতে (১৯৯৩ সালে) তরুণদের একজন আমি তখন, আমার সাথে আরও কতিপয় সহকর্মী - যাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রশ্রয় দিতেন, তিনি শুনতেন, উপভোগ করতেন, সেগুলো একটা শক্তিশালী খাতে প্রবাহিত করে দিতে তিনি বিরাট-বিশাল-উদার-উদাত্ত স্বপ্নের কথা শোনাতেন শেষে। আমরা তা শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় শুনতাম - অনুসরণ করার জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা-পরিকল্পনা করতাম। আজকে তাঁর অনুসৃত সহকর্মীগণ, আমি ছাড়া, যে যেখানে অবস্থান করছেন, নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, অনেকে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন, জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছেন, এর পেছনে পরোক্ষভাবে তার প্রভাব রয়েছে বলে আমি অনুভব করি।

কর্মজীবনের শুরুতেই আমার কী সৌভাগ্য যে এক বিজয়ী বীর মুক্তিসেনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চাকুরির জন্য দেওয়া লিখিত পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার পর মৌখিক সাক্ষাৎকারের টেবিলে ওপারে তিনি পাশে আরেকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তখনও জানি না তিনি আমাদের বাংলাদেশের এক বিজয়ী সেনা। চাকুরির মৌখিক সাক্ষাৎকারে তাঁদের হাতে নির্বাচিত হওয়ার পর কর্মে যুক্ত হয়ে জেনে গেলাম আমি তাঁর সাথে সরাসরি কাজ করবো। যাঁর সাথে কাজ করবো তিনি একজন শব্দসৈনিক। আমার সামনে উপবিষ্ট সৌম্যকান্তি সুদর্শন বস, স্নিগ্ধ কণ্ঠে আমাকে আমার দায়িত্ব কর্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

আমি তখনও বুঝে উঠতে পারিনি কী এক সফল ইতিহাস সৃষ্টিকারীর সাথে আমি কাজ করতে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে কয়েক দিন পর আমি বুঝতে শুরু করলাম, কী এক মহান মানুষ যিনি রক্ত দিয়ে লিখেছেন বাংলাদেশের নাম। উল্লেখ্য, একাত্তরের উদ্দীপনাময় গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি, বাংলাদেশের নাম' তাঁরই লেখা।

আবারও আসি ডিসেম্বর প্রসঙ্গে, কেন ডিসেম্বর এলে তাঁকে এত বেশি মনে পড়ে? এর কারণ তিনি আমাদের ডিসেম্বরে অর্জিত

বিজয়ের অন্যতম নায়ক। যিনি শব্দাস্ত্র ও কণ্ঠ-হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করেছিলেন যা যুদ্ধের সময় ঐতিহাসিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র- কালুরঘাট প্রতিষ্ঠার অন্যতম এই নায়ক জীবন থেকেও বিদায় নিয়েছিলেন এই বিজয়ের মাসে ১৯৯৫ সালে ১০ ডিসেম্বরে।

বলছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক এবং প্রথম সংবাদ পাঠক, শিক্ষাবিদ ও সাক্ষরতাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবুল কাসেম সন্দ্বীপ (১৯৪৫-১৯৯৫) এর কথা। তাঁর জীবনের সবচেয়ে মহতী অবদান ও আকাশছোঁয়া সম্মাননা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক তথা একজন মুক্তিসেনা হওয়ার জন্য। যে বিরল সুযোগ সবার জীবনে আসে না। তিনি সে সুযোগ পেয়েছেন ও কাজে লাগিয়েছেন, সত্যিই তিনি ও তাঁর প্রজন্ম রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের নাম লেখার বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন। আমরা তাঁদের সুযোগ ও সাহসী অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একটি অস্থায়ী বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোবলকে উদ্দীপ্ত করতে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধের সময় প্রতিদিন মানুষ অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য অপেক্ষা করত। "জয় বাংলা, বাংলার জয়" গানটি এ বেতার কেন্দ্রের সূচনা সঙ্গীত হিসাবে প্রচারিত হতো। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ এই কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক, ভাবতে সমীহ, সম্মান ও শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সূচনা ও বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার সাথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা পরস্পর সম্পর্কিত ও ঐতিহাসিক কাল পরম্পরায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের কয়েক হাজার নিরস্ত্র বাঙালি নিধন করে এবং একই সাথে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা এবং একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রদান করে যান। বার্তাটি ঢাকা ইপিআর ওয়ারলেস স্টেশন থেকে সিলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ার গোলাম রব্বানী ডাকুয়ার হাত দিয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতেই। তার পরেই পাকিস্তানীরা ইপিআর ওয়ারলেস ধ্বংস করে দেয়। বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে সাহিত্যিক মাহবুব উল আলমের 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' বইটিতে। ভোর হবার আগেই বার্তাটির শত শত কপি তৈরি হয়ে যায় একটা সাইকোস্টাইল মেশিনের সাহায্যে। চট্টগ্রামের অনেক জায়গায় মধ্য রাত থেকেই মাইকে বার্তাটি প্রচার করা হয়। ২৬ মার্চ দুপুর বেলা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্র হতে প্রথমবারের মত স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ঐ বার্তা পাঠ করেন। এর মধ্যেই বেলাল মোহাম্মদ এবং আবুল কাসেম সন্দ্বীপসহ তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতারকর্মী সিদ্ধান্ত নেন যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে তারা বেতারের মাধ্যমে কিছু প্রচার করবেন। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তারা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর চিন্তা করেন এবং তার নতুন নাম দেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র পরে নিরাপত্তার কারণে শহর থেকে কিছুটা দূরে কালুরঘাটে নিয়ে যান তাঁরা। ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিটে এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি আবার পাঠ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা অনুষ্ঠান করার পর তারা পরদিন সকাল ৭টায় পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রচারের ঘোষণা দিয়ে সে দিনের পর্ব শেষ করেন। সে সময়ই আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রথম সংবাদ আকারে পাঠ করেন। তিনিই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রথম সংবাদ পাঠক। তারপর দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য নিবেদিত তরুণ, স্বাধীন জাতিসত্তার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ মুক্তিসেনা আবুল কাসেম সন্দ্বীপ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রেই ডেরা বেঁধেছিলেন। বেতার কেন্দ্রের সাংগঠনিক ও সম্প্রচারগত পরবর্তী চড়াই-উতরাই ও এর নানান ঘটনাধারায় তিনি যুক্ত থেকেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন একজন শব্দসৈনিক হিসেবে কাটিয়ে দিয়েছেন অকুতোভয়ে কেন্দ্রের শেষ দিন পর্যন্ত, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ।

আমার স্মৃতিতে ভাসে, খুব কাছ থেকে দেখা এই মুক্তিসেনার (সন্দ্বীপ ভাইয়ের) জীবনের অন্তিম দুটি বছর। দৃশ্যকল্পটা এরকম, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আমাদের সন্দ্বীপ ভাই বসে আছেন। নিয়মিত একজনের পর একজন আসছেন। তাঁরা এসে তাঁর সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রসঙ্গ ও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনায় মেতে উঠছেন।

গণসাহায্য সংস্থা, যেখানে আমার শুরু আর যেটা সন্দ্বীপ ভাইয়ের শেষ কর্মস্থল, নব্বই দশকের প্রথমার্ধে, তখন ছিল মোহাম্মদপুরে, স্যার সৈয়দ আহমদ ও ইকবাল রোড জুড়ে, সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ও দেশীয় সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ, শুভ বোধে ও ভাবনায় সমুন্নত আমরা এক ঝাঁক কর্মী বিভিন্ন ভবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করতাম। গণসাহায্য সংস্থার সেসব আলোকিত, বাঙালি জাতীয়তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত তারুণ্যদীপ্ত সহকর্মীবৃন্দ আসতেন সন্দ্বীপ ভাইয়ের কাছে, আসতেন তাঁর সহযোদ্ধা বেলাল মোহাম্মদ, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, উন্নয়ন-কর্মবীর, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক প্রমুখ। সবার সংলাপ-সম্ভাষণে তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা থাকতো সূচনায়। তারপর আলোচনা গড়িয়ে যেতে যেতে কখনো তা সমালোচনায়ও উপনীত হত। বিনয়ী এ মানুষটিকে আমি কখনো - কর্মসূত্রে কাছে থেকে প্রায় দুই বছর ধরে দেখা ও শোনার

অভিজ্ঞতা থেকে- সে ধরনের সমালোচনায় অংশ নিতে দেখিনি-শুনিনি। তিনি মুচকি হেসে শিশুর মতো সরলতায় এড়িয়ে যেতেন নীরবে নিঃশব্দে। পরে দুএকবার তিনি আমাকে বলেছেন, "কিছু পাওয়ার আশায় তো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিইনি, ভাই। কিছু চাওয়াও ছিল না, আজও নেই। চেয়েছি স্বাধীন দেশ, সেটা পেয়েছি। এখন তাকে আমরা নিজেরাই তো শাসন করছি। পর্যায়ক্রমে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কাউকে দোষ দেওয়ার মতো রুচি ও মানসিকতা আমার নেই। কিছু পাওয়ার অভিলাষ আমার নেই।"

একটা স্বাধীন দেশের সৃষ্টিতে যার অবদান আছে, দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্য যিনি জীবন বাজি রেখেছেন, মরণপণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, তাঁর কাছে দেশের উন্নয়ন, দেশের মানুষের উন্নতি ছাড়া কোনো কিছুই স্থান পেতে পারে না। আবুল কাসেম সন্দ্বীপের মুখে সারাক্ষণ দেশপ্রেম, স্বাধীনতার চেতনা, দেশের মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কথাই শোনা যেত। আমাদের পেশাগত কাজের ধারা চলত কর্ম পরিকল্পনা মতো। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে চেতনাধারার মতো কিংবা প্রবহমান বাতাসের মতো অদৃশ্য ও অলিখিতভাবে বয়ে যেত এসব কিছু।

আমাদের কাছে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ছিলেন মুক্তচিন্তা, ও মুক্তিযুদ্ধের চেনা ও উন্নত ভাবনার ঝর্ণাধারা, যেখান থেকে ফল্গুধারায় উৎসারিত হত এসব ভাবনারাজি। সূর্যের আলো যেমন ফুরায় না তেমনি তাঁর কাছ থেকে আমরা অগণিত সহকর্মী বিভিন্ন বিভাগ থেকে ও আরও অনেকানেক গুণগ্রাহী এখান থেকে ওখান থেকে এসে ঐ অফুরান চেতনায় অবগাহন করতাম। আমরা যারা বয়সের কারণে মুক্তিযুদ্ধ করতে পারিনি তাদের কাছে এই কিংবদন্তীর কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে শুধু শুনতে চাইতাম, তাঁদের তারুণ্যদীপ্ত গল্পে উদ্দীপ্ত হতাম আমরা। সন্দ্বীপ ভাই আমাদের কাছে ছিলেন এমনই উদ্দীপনার আলোকবর্তিকা বা বাতিঘর স্বরূপ।

আমি মাঝে মাঝে তাঁকে তাঁর অবদানের জন্য প্রশংসা করেছি, প্রসঙ্গক্রমে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে, সমীহ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছি তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে। তিনি আমাকে যা বলেছেন তাতে আমার তাঁর প্রতি আরও সমীহ বেড়ে গিয়েছিল, যার জন্য আমি তাঁকে আজও স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন, তিনি বলতেন, আমার সময়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, আমি তাতে অংশ নিয়েছি মাত্র। তুমি সে সময় তরুণ হলে, মুক্তিযুদ্ধের সুযোগ পেলে তুমিও অংশ নিতে। আমি যেখানে যে কাজে যুক্ত সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ ও প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গড়ে তুলেছি অন্যদের সাথে, বেলাল ভাইদের সাথে, সবার সাথে কাজ করেছি দেশের জন্য, সেটা এখন ইতিহাস। তবুও এটা একটা ঘটনা মাত্র। এ আর এমন কিছু না রে ভাই। ঘটে যাওয়া ঘটনা মাত্র।"

- দাদা এমন ঘটনার সুযোগ পায় কয় জন? আপনি ও আপনারা পেয়েছেন। আমরা তো পাই নি।

- তোমরা বর্তমান স্বাধীন দেশে জাতির উন্নয়ন ও দেশের উন্নতির জন্য করো। তাহলেই মুক্তিযোদ্ধার সমান কাজ হবে। যখন যে পরিবেশে আছি জাতির উন্নয়ন ও দেশের উন্নতির জন্য কাজ করাই তো দায়িত্ব। খ্যাতি আল্লাহ্ দেন। এটা চেয়ে পাওয়া যায় না। আমরা খ্যাতির জন্য কাজ করিনি। মনের টানে প্রাণের তাগিদে কাজ করেছি। তবে আমার সকল কাজে আবেগ ও আনন্দ ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উপরের কথাগুলোর মতো অনেক সুন্দর উদ্দীপনাময় কথা যা তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। একজন দেশপ্রেমিক ও বিজয়ী মুক্তিসেনার সেই অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী আমি চিরদিন স্মরণ করবো।

আমার দেখা ভালো মানুষগুলো সবসময়ই শিশুর মতো সরল, তাদের মনের ভেতরটা নিসর্গের মতো সবুজে-শ্যামলে রঙিন উজ্জ্বল, সেখানে বসবাস করে এক-একটি রূপক শিশু। যার ফলে তাদের চিন্তাচেতনা দৃষ্টিভঙ্গি আবেগ কাজ সমাজের সবার চেয়ে আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আবুল কাসেম সন্দ্বীপের মধ্যেও এমনই সরলতা ও সততার মূর্তিমান একটি শিশু আমি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করতাম। তাঁর এই স্বচ্ছ কাঁচের মতো চরিত্রকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতাম, উপভোগ করতাম। কিন্তু দু একজন যে এ কাঁচে কালিমা লেপন করতে চায় নি তা-ও নয়। মজার বিষয় হল, তিনি গুটিকয় চতুর শেয়ালদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাঠ করতে পারতেন। তাঁর ব্যবহার ছিল শিশুর মতো সরলতায় সমৃদ্ধ, কোনোক্রমেই শিশুসুলভ ছিলেন না তিনি। অশুভ বোধসম্পন্ন মানুষের আচরণে তিনি বিচলিত হতেন না, তাঁর নিজস্ব চারিত্র্যেই তিনি সুদৃঢ় অবস্থান নিতেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল দুর্লভ, মুক্তিযোদ্ধা-সুলভ। আসলে তিনি একজন বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা, যা তাঁর সকল কাজে ও আচরণে প্রকাশ পেত। একজন মুক্তিযোদ্ধার যেমন চিন্তাভাবনা, আচার-ব্যবহার ও কর্ম হওয়া উচিত তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন সন্দ্বীপ ভাই। তিনি সারা জীবন তাঁর প্রতিটি কাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, আমার জীবনের সকল কাজ দেশের জন্য, জাতির জন্য- কোনো কিছুই আমি শুধু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য করিনি। আসলেই তাই, যদি তার জীবনের কর্মধারা শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পর্যালোচনা করে তা-ই দেখতে পাই।

এমন মানুষের সান্নিধ্য সবাই পেতে চায়। ফলে তাঁর সান্নিধ্য প্রত্যাশী মানুষের আগমনে তাঁর কক্ষটি সবসময় সরগরম হয়ে থাকতো। একটা তারকা বা স্টারের মতো খ্যাতির সুবাসে যেন মানুষ ছুটে আসতো তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল গণসাহায্য সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিসের একটি ভবনে, মোহাম্মদপুরের স্যার সৈয়দ আহমদ রোডে। একটু কথা বলার জন্য, একটু দেখা করার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য, বাংলাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলনের শুরুর কথা শোনার জন্য, দেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলার গল্প শোনার জন্য। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত সময় ছিল কম। তাতে তিনি বিরক্ত

হতেন না। তিনি এও বলতেন, আমার আয়ু কম, রোগাক্রান্ত মানুষ। যে কোনো সময় চলে যাব। যাবার আগে বলে যেতে চাই। অনুপ্রেরণা দিতে চাই তোমাদের। তাঁর রক্তে বোধ করি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই অঙ্গীকার "চলে যাবো তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল" এর মতো ব্রত প্রচ্ছন্নভাবে ছিল বহমান। আমাদের তরুণদের পেলে তিনি একটু বেশি উজ্জীবিত হয়ে যেতেন। বলতে শুরু করতেন তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণ, সাক্ষরতা আন্দোলন, বিশেষ করে নিরক্ষরমুক্ত জেলার গল্প ইত্যাদি। তিনি তরুণদের মধ্যে তাঁর ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের কথা শোনাতেন।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা একাত্তরের মতো এমন একটি ঐতিহাসিক মুক্তিসমরে জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহসী দায়িত্ব পালন শেষে বিজয়ী বীরের বেশে মানুষের মাঝে ফিরে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু সেজন্য তাঁর মধ্যে গর্বের লেশমাত্র ছিল না, কোনো দিন খুঁজে পাইনি। তাই, আমরা যাকে বলি ইতিহাস তাঁর কাছে তা জীবনের ঘটনাচক্রে কর্মধারায় নিত্যঘটে যাওয়া ঘটনা মাত্র। আবুল কাসেম সন্দীপ যতই বিনয়ের সাথে বলুন না কেন, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ কোনো হঠাৎ সিদ্ধান্ত নয়, তাঁর শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা, বিভিন্ন ঘটনাধারায় যুক্ত হওয়া লক্ষ করলে বোঝা যায় তিনিও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতোই নিজেকে দেশের জন্য তৈরি করছিলেন। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের তেজোদ্দীপ্ত আলো ছিল বলেই তিনি জীবন-মরণের ব্যবধানকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সকল মুক্তিযোদ্ধারাই এরকমই সাহসী চেতনার অধিকারী ছিলেন। এরকম সাহসে ভর করেই দেশের জন্য জীবন দিতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর, ছাত্রজীবনের নানা পর্যায়ে তিনি নানাভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সংক্ষেপে তাঁর জীবনের কিছু দিক ও সময়ের সাথে তাঁর বেড়ে ওঠার ঘটনাধারা তাই এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

রাজনীতি ও নেতৃত্ব: আবুল কাসেম সন্দীপ ছাত্রনেতা হিসেবে ১৯৬২-৬৪ সালে সরকারি আই, আই কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৪-৬৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজ বাংলা বিভাগের সাহিত্য সম্পাদক, ১৯৬৫-৬৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের বার্ষিকী সম্পাদক, ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১৯৬২-৬৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সদস্য এবং ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার নির্মাণ কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিকতা: তিনি ১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত দৈনিক জমানা (চট্টগ্রাম), সাপ্তাহিক জমানা (চট্টগ্রাম), দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম)-এ সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগরতলা ও কলকাতায় সংবাদ লেখার দায়িত্ব পালন করেন এবং বেতারে বাংলা খবর পাঠ করতেন।

শিক্ষণ ও শিক্ষকতা: শিক্ষণ ও শিক্ষকতার প্রতি আবুল কাসেম সন্দীপের প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল। ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত তিনি সমাজকল্যাণ বিভাগের শহর উন্নয়ন প্রকল্প চট্টগ্রামের অধীনে বয়স্ক নৈশ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং ১৯৬৩-৬৫ সাল পর্যন্ত একই প্রকল্পে শিক্ষকতা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি জুন ১৯৭০ থেকে ৮ মার্চ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ফটিকছড়ি কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি: আবুল কাসেম সন্দীপ ১৯৬০-এর দশক থেকে চট্টগ্রাম বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার ও নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সংসদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ তিনি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। তিনিই এ কেন্দ্রের পৃথম কণ্ঠ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি 'ডিকারেশন অব ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' সংবাদ আকারে প্রচার করেন। মুক্তিযুদ্ধে বহুল প্রচারিত গান 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম' এর গীতিকার তিনি।

কর্মজীবন: আবুল কাসেম সন্দীপ গণশিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক, ভিইআরসি'র (VERC- Village Education Research Centre, Savar) সমন্বয়কারী ও উপ-পরিচালক এবং গণসাহায্য সংস্থায় কর্মসূচি সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণচীন, কিউবা, ভারত, থাইল্যান্ড, জাপান, ফিলিপাইন, তাইপে, হংকং সফর করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা: মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অবদানের জন্য আবুল কাসেম সন্দীপ ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক, ১৯৮৬ সালে আজিজুর রহমান সাক্ষরতা পুরস্কার, ১৯৮৯ সালে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি, স্বাধীনতা ও সাক্ষরতায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ১৯৯৮ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর), ২০০২ সালে চাঁদ সুলতানা সাক্ষরতা পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন।

আমি সন্দীপ ভাইয়ের নৈকট্য পেয়েছি। আমি গর্বিত যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রহরে তাঁর মতো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার চেতনাধারায় অভিষেকের সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার জীবনের পাথেয়, সুখের স্মৃতি, গর্বের গল্প, আলোকিত ভাবনায় উদ্দীপ্ত থাকার প্রেরণা। আমি মুক্তিযোদ্ধা, সাক্ষরতা আন্দোলনের পুরোধা ও মহৎ মানুষের প্রতিকৃতি আবুল কাসেম সন্দীপকে স্মরণ করছি, করে যাবো। তাঁর সাথে আমার কর্মজীবনের সূচনা আমার জীবনের সুখস্মৃতি, একজন দীপ্ত অঙ্গীকারাবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমার প্রায় হাজার দিনের কর্মময় স্মৃতির গর্ব আমি জাগিয়ে রাখতে চাই আমৃত্যু।

শহীদুল্লাহ শরীফ
শিক্ষা-গবেষক ও লেখক, আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ হাসান খালেদ

কৃষিঋণ বিতরণে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৯.৯৫ শতাংশ। কৃষি এককভাবে জিডিপির সর্ববৃহৎ খাত। কৃষিখাতে দেশের মোট কর্মশক্তির প্রায় ৪৭.৫ শতাংশ লোক নিয়োজিত রয়েছে। কয়েক দশকে দেশের কৃষিখাতে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক কৃষি জমি বর্তমানে একের অধিক ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বছর জুড়ে শস্যের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির নিবিড়তা বেড়ে চলছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন এবং মৌসুমী বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। কৃষির উপ-খাত মৎস্য ও পশুখাতের ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সকল খাতেও কর্মসংস্থান বাড়ছে। কৃষিখাতের উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তাসহ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কৃষিখাতের উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল।

জমির আকার অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট কৃষকের শতকরা ৩৮.৬৩ ভাগ প্রান্তিক চাষী, ৪৯.৮৬ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক, ১০.৩৪ ভাগ মাঝারি শ্রেণির কৃষক এবং ১.১৭ ভাগ তদূর্ধ্ব শ্রেণির কৃষক। এছাড়াও মোট কৃষকের প্রায় ১৪.০৩ ভাগ কৃষক ভূমিহীন, যারা মূলত বর্গাচাষী হিসাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ ৮৬.৬৯ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা ৬০.৬১ ভাগ। আমাদের কৃষকদের নানা সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হ'ল কৃষিঋণ প্রাপ্তি।

বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের মাঝে ঋণ প্রদানের ইতিহাসও দীর্ঘদিনের। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বিশেষ করে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে এ ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এক সময় যেখানে কৃষকদের অর্থায়ন করা হতো দুর্যোগ-উত্তর পুনর্বাসনে এখন এই ঋণ প্রদান করা হচ্ছে উৎপাদনের শুরুতেই। অর্থায়ন কৌশলে একসময় স্থান ছিল না ক্ষুদ্র, বর্গা ও প্রান্তিক চাষীদের কিন্তু এখন এরাই কৃষিঋণ পাচ্ছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। অতিসম্প্রতি, কৃষিঋণ প্রদানে সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকগুলোকেও এগিয়ে আনার উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবৎসরে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো প্রায় ১৪৬ বিলিয়ন টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণ বিতরণ ত্বরান্বিত হলেও প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ ব্যাংকগুলো হতে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনও প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হয়। এখনও কৃষিঋণ বিতরণে স্বজন-প্রীতি বিদ্যমান। এর পরেও যারা ঋণ পেয়ে থাকেন তাদের অনেকেই সময়মত ও চাহিদামাফিক ঋণ পান না। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মানবসম্পদের অপ্রতুলতা, অদক্ষ মনিটরিং ব্যবস্থা, কৃষিঋণ প্রদানে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নেতিবাচক মানসিকতা এবং কৃষিঋণ প্রদানে ভুল কৌশল ইত্যাদি কারণে ব্যাংকগুলো কৃষিঋণের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখাতে পারছে না। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামাঞ্চলে শাখার অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং-এর দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষিঋণ প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Non-governmental Organization (NGO) যাদের প্রায় সবগুলোই Microcredit Regulatory Authority (MRA) এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, তাদের মাধ্যমে বড় অংকের কৃষিঋণ বিতরণ ইতোমধ্যে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। আশির দশকের শুরুতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর অনেকেই সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ সেবা চালু করে ছিল। সেসময় তারা মূলত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করা, কৃষি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ব্যবহার এবং বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করতো। তবে প্রথম দিকে এ সকল প্রতিষ্ঠান কৃষিঋণ প্রদান করত না। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তারা 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)'-এর আর্থিক সহযোগিতায় ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে লিংকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৃষিঋণ প্রদান করছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নেটওয়ার্ক সংগঠন Credit Development Forum (CDF) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৩ সালে ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মোট

২৬৫.০৯ বিলিয়ন টাকা (শস্যখাতে ১৯২.২২, মৎস্যখাতে ২০.১০, গবাদি পশুখাতে ৫২.৭৮ বিলিয়ন টাকা) কৃষিখাতে বিতরণ করে। যা ঐ বছরের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিতরণকৃত ঋণের ৪৭.০৮ শতাংশ। CDF-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪ সালে বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৩০৩.৫১ বিলিয়ন টাকার কৃষিঋণ প্রদান করে যার মধ্যে ৭১ শতাংশ শস্যখাতে, ৭.৩৭ শতাংশ গবাদি পশুখাতে ও ২১.১৪ শতাংশ মৎস্যখাতে।

আশির দশকের শেষ দিকে গ্রামীণ ব্যাংকের বিকাশ, দাতা সংস্থার অর্থায়ন সংকোচন যখন দৃশ্যমান হচ্ছিল সেসময় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে আগ্রহী, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯০ সালে সৃষ্টি হয় "পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)"। প্রাথমিক অবস্থায় পিকেএসএফ প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কাজ শুরু করে। পিকেএসএফ মূলত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তার কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে। বাস্তবিক পক্ষে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মূল পেশা কৃষি তাই ঋণের একটি বৃহৎ অংশ কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। দেশের কৃষিক্ষেত্রে শস্যের নিবিড়তা ও প্রাণী সম্পদ লালন-পালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে বছরব্যাপী এই ঋণের প্রচুর চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছিল। ফলশ্রুতিতে, পিকেএসএফ তার মূলস্রোত ধারার একটি অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে কৃষিঋণ বিতরণ শুরু করে।

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষিঋণ কার্যক্রমটি 'সুফলন' নামে পরিচিত। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে পিকেএসএফ তার সহযোগী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ৯.৬৯ বিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। এ ছাড়াও ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে কয়েক বিলিয়ন টাকার ওপর কৃষিঋণ প্রদানের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ তার কৃষিখাত ঋণ কর্মসূচির জন্য কৃষক বান্ধব নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণের নিয়ম-কানুন বিশেষ করে সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় পদ্ধতি কৃষিঋণ ব্যবস্থার জন্য বাস্তবসম্মত নয়। তাই কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনায় সাপ্তাহিক কিস্তির স্থলে এককালীন কিস্তি প্রদান পদ্ধতিও চালু করে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষিঋণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং বেশ কিছু প্রকল্প শেষ হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ ও কৃষিখাতে ঋণ প্রদান ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর ও টেকসই করার জন্য শুধু ঋণ প্রদান করলে হবে না। পাশপাশি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও তথ্য আদান-প্রদানও জরুরি। তাই পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনার অর্থায়নের পাশপাশি প্রশিক্ষণ ও কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্প্রসারণকে আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষিঋণ ব্যবস্থাপনা হতে এ জায়গায়ই স্বতন্ত্র। লাগসই কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার টেকসইভাবে কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ তার সহযোগী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়কের ভূমিকা নিয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ জলবায়ুর পরিবর্তন। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধান, বন্যা ও খরা-সহিষ্ণু ধান ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদের সাথে পরিচিত হচ্ছে ও মাঠ পর্যায়ে এ সকল ফসল উৎপাদন করছে। পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও কৃষিঋণ গ্রহীতাদের কৃষি বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো তাদের বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিঋণ প্রদান করছে। এই বিশাল নেটওয়ার্কের ফলে এসকল প্রতিষ্ঠান হতে প্রকৃত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ কৃষিঋণ ও কারিগরি সহায়তা পাচ্ছে। মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। এই সংস্থাগুলোর উদ্যোগ সরকারের সহায়ক হিসেবে নিবিড়ভাবে মাঠ পর্যায় কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিল স্বল্পতা, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের অতিমাত্রায় বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি, গতানুগতিক কায়দায় ঋণ বিতরণের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষিঋণের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারছে না। এছাড়াও যেসব ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে সহযোগিতায় কৃষিঋণ বিতরণ করছে সে ক্ষেত্রে কৃষক নির্বাচন ও ঋণের প্রকৃত খাত ঠিক থাকছে না। কৃষিঋণ সম্প্রসারণ এবং এই ঋণের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এই সকল সমস্যা সমাধান করা জরুরি।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ভাবনার প্রথমেই স্থান দিতে হবে কৃষকের উন্নয়নকে। এই ভাবনা থেকেই আবর্তিত হবে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তির সুযোগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কৃষক ও কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি স্থান দিতে হবে কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাসকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নতুন কর্ম কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

মুহম্মদ হাসান খালেদ
মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি যখন পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে আবির্ভূত হলো তখন দুনিয়ার সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই তখন কয়েক যুগ ধরে মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল। কিন্তু বাঙালিরা চাপিয়ে দেয়া সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার মাত্র নয় মাসের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে লাল-সবুজের বিজয় পতাকা উড়াতে সক্ষম হয়। এই অভূতপূর্ব বিজয়ের মাধ্যমে এবং তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

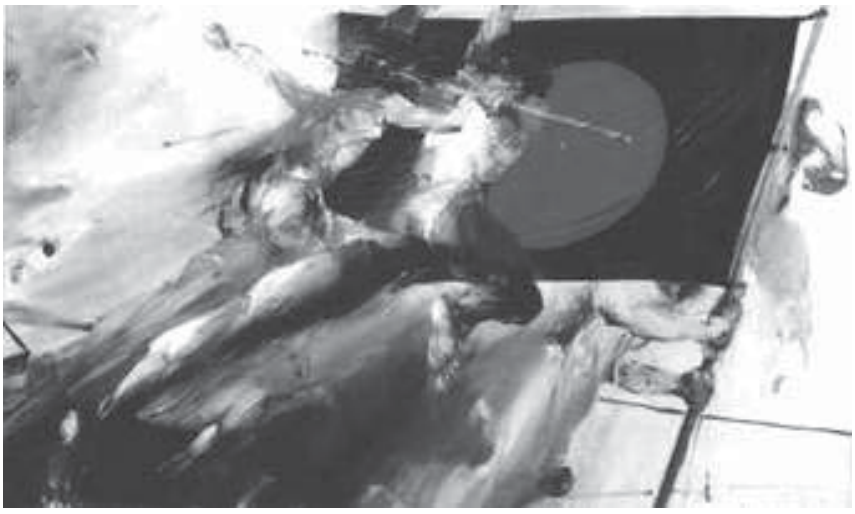

জাতি হিসেবে বাঙালি পায় নবপ্রতিষ্ঠা। হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি এই প্রথম অর্জন করে এক ঐতিহাসিক জাতিরাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রচিত হয় সংবিধান। তাতে স্বপ্নকল্প ব্যক্ত হয় জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্র অভিমুখী আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের।

আমাদের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গুরুত্ব অপরিসীম। রক্ত, অশ্রু ও আত্মত্যাগ, দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রাম ও অসাধারণ বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। পেয়েছি একটি মানচিত্র, লাল-সবুজ পতাকা ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ কি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকবে কি না তা নিয়ে নানা মত ছিল। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সেই পথে অন্তরায় সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত উত্থাপিত হয়। সত্তরের দশকের শুরুতে অনেক হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য এসেছে। কেউ বলেছেন এটা 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি', কেউ বলেছেন এই দেশ উন্নয়নের একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র (ফাল্যান্ড ও পারকিনসন ১৯৭৬) এবং বাংলাদেশ যদি তার উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যেকোনো দেশই তা পারবে।

কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি কোন ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের গতিপথ কখনোই মসৃণ ছিল না। নানান চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে আমাদের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কোটি কোটি মানুষের মুখে খাবার তুলে দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। অথচ আবহমান কাল ধরে বাংলা ছিল সৌন্দর্যে, সম্পদে ঐশ্বর্যময়। এই ঐশ্বর্যের লোভে যুগে যুগে এখানে এসেছে নানা জাতিগোষ্ঠী। বিভিন্ন সময়ে বাংলা শাসন-কবলিত হয়েছে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, তুর্কি, আফগান, মোগল ও ইংরেজ শাসনের। তাদের প্রভাব পড়েছে বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে। বাংলার গ্রাম-সমাজে লেগেছে ভাঙনের ছোঁয়া। বিশেষ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কবলে পড়ে বাংলা বিপুল ও নির্মম শোষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সাড়ে চার দশক ধরে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য। জনগণের শ্রম, মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির জোরে দেশটা এগিয়েছে অনেক দূর। আরও অনেক দূর

যাওয়ার কথা ছিল। কিন্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ঐক্যমত্যের অভাবে দেশের উন্নয়ন অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশটিতে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, যেসব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা প্রকট হয়েছিল, তাতে অবশ্য অর্থনীতির অগ্রগতি সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার তেমন কারণ ছিল না। ঊনিশ'শ একাত্তরে দেশের অবকাঠামো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ সেতু, কালভার্ট ধ্বংস হয়েছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। বিপুল জনসংখ্যা সে সময়ে উদ্বাস্তু হয়েছিল। স্বাধীনতার পর তাদের পুনর্বাসন ছিল একটি দুরূহ কাজ। বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে আমদানিকৃত পণ্যের অভ্যন্তরীণ বণ্টন কঠিন ছিল। কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রে এই সমস্যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা যায়।

শিল্প খাতের প্রধান সমস্যাটি এসেছিল অন্যদিক থেকে। বৃহৎ শিল্পের একটি বড় অংশের মালিকানা ছিল পাকিস্তানীদের হাতে। তারা বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার পর এগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে আনা হয়। এগুলোর পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তির সংকট ছিল।

দেশটিকে এই পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়েছিল যখন সামগ্রিকভাবে ছিল সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং উচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্বের চাপ। ফলে শুরুতে দেশের এক বিশাল জনসংখ্যা ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। শিক্ষার হার ছিল খুব কম। এসব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে অর্থনীতি ও উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল একটি গুরুভার বিষয়।

তারপরও অজস্র নেই-এর শেকলে বাঁধা বাংলাদেশ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এগিয়ে চলছে। সকলের জন্য অন্ন আর বস্ত্রের সংস্থান করার যে সংগ্রামী জাতীয় জীবন আমাদের ছিল তা এখন অতীত। বরং এখন পৃথিবীর সর্বত্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পরে মানুষ চলছে। ক্ষুধা-মঙ্গার দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশে আজ পাকিস্তানী আমালের তুলনায় জনসংখ্যায় দ্বিগুণ হলেও মানুষ দু'বেলা ভাত খেতে পায়।

দারিদ্রতা হারের পরিবর্তন
(সময়কাল: ১৯৭৩-২০১৫)

বছর	দারিদ্রের হার (%)
১৯৭৩-৭৪	৮২.৯
১৯৯১	৫৬.৬
১৯৯৫	৫০.১
২০০০	৪৮.৯
২০০৫	৪০
২০১০	৩১.৫১
২০১১	২৯.৯
২০১২	২৮.৪
২০১৩	২৭.২
২০১৪	২৬.০
২০১৫	২৪.৮

সূত্রঃ Four Decades of Economic Development of Bangladesh: An Assessment; Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015; Bangladesh Economic Review; World Bank Data

খাদ্যেও স্বয়ংসম্পূর্ণ আজ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আজ দারিদ্র্য দূরীকরণে শুধু সফলই হয়নি, দারিদ্র্যের হার ১৯৭১ সালের ৭০%'র বেশি থেকে ২০১৫তে ২৪.৮%-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, বর্তমানে অতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১২% - যা পৃথিবীর অনেক দেশের পক্ষেই ব্যাপক ভাবনার বিষয়। একসময়ে পশ্চিমা বিশ্বের পন্ডিতেরা যাকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে দেশটি টিকবে কি না সেই প্রশ্ন তুলে ব্যঙ্গ করেছিল, সেই সমালোচনা আর ভ্রুকুটির উচিত জবাব দিয়ে আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু আয় আজ বেড়ে ১,৩১৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির চিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, তাই বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের থেকে 'নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ'-এর কাতারে স্থান দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি আমেরিকার প্রভাবশালী ম্যাগাজিন ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্রুত মানব উন্নয়নের সাফল্যের জন্য বাংলাদেশকে আখ্যা দিয়েছে 'দক্ষিণ এশিয়ার মানদণ্ডের ধারক' হিসেবে বাংলাদেশ সম্পর্কে অতীতের নিরাশাবাদী মূল্যায়নের পরিবর্তে বর্তমানে একটি ইতিবাচক ধারণা উচ্চারিত হচ্ছে। গোল্ডম্যান স্যাকসের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি আশু সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ১১টির মধ্যে রয়েছে। জেপি মর্গান এক কদম এগিয়ে দেশটিকে অগ্রসরমান দেশগুলোর মধ্যে ফ্রন্টিয়ার ফাইভে উন্নীত করেছেন। সিটি গ্রুপের ভবিষ্যদ্বাণী আরো উৎসাহব্যঞ্জক; বাংলাদেশ এখন থ্রিজি অর্থাৎ থ্রি গ্লোবাল গ্রোথ জেনারেটর গ্রুপে। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় মূল্যায়ন সংস্থা পিউয়ের এক জরিপে উঠে এসেছে যে বাংলাদেশের ৭১ শতাংশ লোক তাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট। সংস্থাটির অন্য একটি মূল্যায়ন অনুসারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা আরো উন্নত জীবন পাবে বলেও মনে করে ৭১ শতাংশ মানুষ। সিএনএনের সাম্প্রতিক একটি মূল্যায়নেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সাধুবাদ দেওয়া হয়। অর্থনীতির অগ্রগতির পরিমাপে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড ভোক্তাসূচকে আস্থা সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ৬৬.৪ শতাংশে উঠে এসেছে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বায়নের পটভূমিকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব লাভ করেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। গত তিন দশক, ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৩ সালের মানব উন্নয়ন সূচকে সামনের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলেই ধারণা করা যায়।

সারণী: মানব উন্নয়ন সূচকের মান

বছর	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০০৫	২০০৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
সূচকের মান	০.৩৩৬	০.৩৮২	০.৪৫৩	০.৪৯৪	০.৫১৫	০.৫৩৯	০.৫৪৯	০.৫৫৪	০.৫৫৮

সূত্রঃ Human Development Report, 2014, UNDP

মানব উন্নয়ন সূচকের অগ্রযাত্রায় শিক্ষা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে নানাবিধ পদক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি হিসাবে নেয়া হয়েছে, যা পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম হিসাবে চালু রয়েছে। নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত উপ-বৃত্তি কার্যক্রম চালু রয়েছে। বছরের প্রথম দিনই নতুন ক্লাসের বই পৌঁছে যাচ্ছে শিশুদের হাতে। সরকারি নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের ফলে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সাক্ষর করতে সক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি ১০০ জনে ৪৩ জন, অর্থাৎ সার্বিক সাক্ষরতার হারের অগ্রগতি ঘটেছে শতকরা ৭২ ভাগ। তথ্যমতে বর্তমানে এই সাক্ষরতার হার প্রায় ৭০%। বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে। ১৯৭২ সালে যেখানে মাত্র ৬১% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী শিশু ভর্তি হতো বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭.৭%। বিশ্বব্যাংকের ২০১২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ছিল ১:৫০.৬৯ সেখানে ২০১৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১: ৪২। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারেও এসেছে পরিবর্তন। ২০০৬ সালেও যেখানে ৫০.৫% প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঝরে পড়ত, মাত্র ১০ বছরে তা ২৯.৬% কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৯%-এ। শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন। ১৯৭৪ সালে যেখানে জিডিপি'র ১.১১% শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হতো ২০১৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২.৩ %।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের (২৫ বছর বা তার বেশি) স্কুলে শিক্ষা নেওয়ার গড় সময় ছিল ২ দশমিক ৪ বছর। বর্তমানে সেটি বেড়ে ৫ দশমিক ১ বছরে উন্নীত হয়েছে।

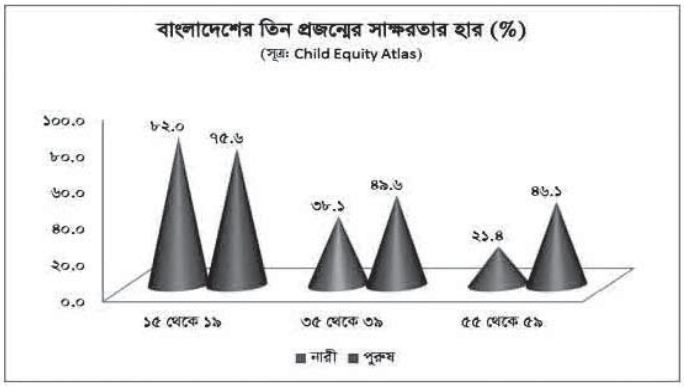

সাক্ষরতা হারের অগ্রগতি
(সময়কাল: ১৯৭১-২০১০)

সময়কাল	সাক্ষরতার হার
ডিসেম্বর ১৯৭১	১৬.৮%
১৯৭৪ (বিবিএস)	২৫.৯%
১৯৯১ (বিবিএস)	৩৫.৩%
২০০১ (১৫ এবং তদুর্দ্ধ, বিবিএস)	৪৭.৯%
২০০৮ (১৫ এবং তদুর্দ্ধ, বাংলাদেশে সাক্ষরতা মূল্যায়ন জরিপ, বিবিএস)	৪৮.৮%
২০১০ (১৫ এবং তদুর্দ্ধ, বাংলাদেশে সাক্ষরতা মূল্যায়ন জরিপ, বিবিএস)	৫৯.৮২%
২০১৩ (বিশ্ব ব্যাংক ডাটা)	৬০%
ডিসেম্বর '৭১ থেকে ২০১৩ সাল সার্বিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি	৪৩.২%

সূত্রঃ Reaching the 2015 Literacy Target; Delivering on the promise; Bangladesh Economic Review; World Bank Data (http://data.worldbank.org/country/bangladesh)

আর Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh (জুলাই, ২০১৩) অনুযায়ী তিন প্রজন্মেও সাক্ষরতার হার বিবেচনায় সাম্প্রতিক কালে শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ২০১০ সালে আমরা পেয়েছি একটি শিক্ষানীতি, যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পরিবর্তন আসবে বলে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারনা।

শিক্ষার মত স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে বাংলাদেশের উন্নতি লক্ষণীয়। ১৯৭১ সালের তুলনায় বাংলাদেশে যে এসকল খাতসমূহে অগ্রগতি হয়েছে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় বাংলাদেশ কান্ট্রি পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক (সিপিএফ)' শীর্ষক কর্মশালায় বিশ্বব্যাংকের উপস্থাপিত প্রতিবেদন থেকে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী-

- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর, আর বর্তমানে তা ৭০ বছরে উন্নীত হয়েছে;
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৪৯ জন। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার

কমিয়ে ৩৩ জনে নামিয়ে এনেছে। প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের হার প্রায় আটগুণ বেড়েছে। বিকল্প সেবাযত্নের হার বেড়ে ২০১৪ সালে ৭৯ শতাংশে এসেছে।

- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে জন্মহার (প্রতি নারীর) ছিল ৬ দশমিক ৯ জন শিশু। বর্তমানে সেটি কমে বাংলাদেশে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ২টি শিশু (প্রতি নারী)।
- শিশুর টিকাদানে বাংলাদেশের অগ্রগতির হার উন্নত দেশগুলোকেও বিস্মিত করেছে। ১৯৭১ সালে প্রতি ১০০ জনে মাত্র ২ জন শিশুর টিকাদান নিশ্চিত হতো। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশু টিকা নিচ্ছে।
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৩৪ জন শিশু জন্মের পর অপুষ্টির শিকার হতো। তা বর্তমানে ১৬ জন।
- ১৯৭১ সালে দেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় ছিল। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫৭ শতাংশ মানুষ এই সুবিধা পাচ্ছে।

তবে একথা সত্য, স্বাধীনতার সাড়ে চার দশকেও কি আমরা পেরেছি মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে? অথচ মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানস কাঠামো বিনির্মাণ। এ দু'টোর কোনোটিই অর্জিত হয়নি।

আমাদের সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাজারব্যবস্থা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে চালু রয়েছে তা বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে: বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বাড়ছে সুপার ধনী। জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা– পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। মাত্র ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের প্রায় ২৫% দখল করে আছে। দেশে এখনও ২.৯% জনগোষ্ঠী ঝুপড়িতে বাস করে। মাথা পিছু আয়, দেশের মোট জাতীয় আয় এবং সেই সঙ্গে মাথাপিছু আয় বাড়লেই সব মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ে না। দেশে একজন কোটিপতি তৈরি হলে, তাঁর জন্য এক হাজার মানুষকে গরিব হয়ে যেতে হয়। অর্থনীতির এটাই নিয়ম। একদিকে বিলাসবহুল গাড়ীর নতুন শো-রুম আর চোখ ধাঁধানো শপিং মল, আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি দরিদ্রতার মাত্রা তীব্রতর হচ্ছে, জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সাগরে ভাসমান অভিবাসন-প্রত্যাশী মানুষের আহাজারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দারিদ্র্য কত প্রকট, কর্মসংস্থানের কী দুরবস্থা! মানুষ কতটা বেপরোয়া হলে এ রকম ঝুঁকি নেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ অনুদান এসেছে তার বড় অংশই দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তেমন একটা কাজে লাগেনি, হয়েছে লুট-পাট। বছরে এখন জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে, খেলাপি ঋণ-সংস্কৃতি আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। গুটিকয়েক ক্ষমতাধর বছরে কোটি কোটি টাকা ঘুষ খাচ্ছেন এবং তা নাকি নেন গুনে গুনে। আর এগুলিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে; মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কাজ করছে; প্রকৃত মানব উন্নয়ন ব্যাহত করছে। মুক্তিযোদ্ধারা এমন ধারার বাংলাদেশ চান নি। আর এর সত্যতা মেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্ণর ড. আতিউর রহমানের পরিচালিত এক গবেষণায়। এই গবেষণায় দেখা যায় ৯১ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা শোষণ-মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন, ৭০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা চেয়েছিলেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে। মুক্তিযুদ্ধের বড় একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল গণমানুষের মুক্তি। যে অর্থনীতিতে মানুষ পেট পুরে ভাত খাবে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা পাবে, থাকবে আবাসনের ব্যবস্থা, যোগ্যতা অনুযায়ী পাবে কাজ– কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির পরম এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন মহান সংবিধানে ঘটলেও স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও রয়েছে এখনও আমাদের পশ্চাদপদতা। নীচের সারণীটি শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের করণীয় স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় এখন আমাদের প্রায় ৪০ লাখ (২৩%)

৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু সংখ্যা

(আদমশুমারী, ২০১১)

বিবরণ	হার(%)
কখনোই স্কুলে যায় নি	১১
ঝরে পড়া	২
নির্ধারিত বয়সের পরে (দেরীতে) স্কুলে যায়	১০
মোট	২৩

সূত্র: Out of school Children in Bangladesh, Decenber 2014

৬-১০ বছর বয়সী প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশু স্কুলে যায় না, যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু হিসাবে চিহ্নিত। এদের মধ্যে ১১% শিশু কখনোই স্কুলে যায় নি, আর ১০% শিশু স্কুলে যাওয়ার নির্ধারিত বয়সের পরে (দেরীতে) স্কুলে যায়।

'সবার জন্য শিক্ষা' এই চেতনার স্বীকৃতি রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে। এই সংবিধানের বেশ কয়েকটি ধারায় শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তথাপি আমাদের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে উল্লেখ করা হয় নি।

কথাটা আক্ষরিক অর্থে ঠিক। শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি না থাকার ফলে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি বড় ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য; যেখানে অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে নয় বরং সুযোগের ভিত্তিতে এটি অর্জনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়েও ঔপনিবেশিক ও পশ্চাদপদ শিক্ষা কাঠামো এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আজও। বরঞ্চ রাষ্ট্রের দায়িত্বে সবার জন্য একই ধরনের শিক্ষার কথা থাকলেও এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা-ইংরেজী ভিত্তিক দেশী-বিদেশী-মিশ্র ধারার স্কুল এবং আরবী ভাষার প্রাধান্য দেয়া মাদ্রাসার সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক অন্যান্য খাতেও রয়েছে নানা বঞ্চনা। রাষ্ট্রীয় খাতে চিকিৎসা সেবার যতটুকু না প্রসার ঘটেছে, তারচেয়ে প্রসার ঘটেছে বেসরকারীখাতে। ফলে স্বাস্থ্য সেবা লাভ এখন অধিকারের পরিবর্তে সুযোগে পরিণত হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষে-মানুষে এবং অঞ্চলে-অঞ্চলে বৈষম্য কমানোর কৌশলও ঠিক করতে হবে। এটাই এ মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অব্যাহত। সর্বোপরি যে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বিনির্মাণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরম আকাঙ্ক্ষা, তা আজ তা দুরাশা মাত্র। সাম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া প্রগতিশীলদের হত্যা কিংবা হত্যার হুমকি এই আশঙ্কাকে আরও দৃঢ় করেছে। বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা শঙ্কিত করেছে গণমানুষকে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ দুটি প্রধান দলের মুখোমুখি অবস্থানে প্রায়শই উত্তপ্ত থাকে। একথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, দেশের বড় বড় সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে ঐ সকল বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই লক্ষ্যে কোনো অগ্রগতি হয়নি। সরকার ও বিরোধীদল উভয়ই উভয়কে দেখেছে প্রতিপক্ষ হিসাবে। বাংলাদেশে বিরোধী দলসমূহ কখনও কার্যকর অবদান রাখেনি বা রাখতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের দেশের এই অগ্রগতির ধারা এখানেই কী শেষ? নাকি আরও দূরে আমরা যাব? সময় এসেছে আজ নতুন লক্ষ্য নির্ধারণের, সমতাভিত্তিক যথাযথ নীতি প্রণয়ন এবং এই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। তবেই সম্ভব লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পূরণ।

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

উন্নয়ন কর্মী

শ র্ব রী আ লো ম য়ী

বাঙালির জীবনধারায় মেলার বিবর্তন

আমাদের সমাজে বহুকাল আগে থেকেই একটা প্রবচন চালু আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এমন একটা প্রবচনের মধ্যে মিশ্র অর্থ লুকিয়ে থাকে বলে মনে হয় আমার। প্রতি মাসে গড়ে একটার চেয়ে বেশি পার্বণ পালন করার ব্যাপারটা যতটা না বিশিষ্টার্থক, তার চেয়ে আদিখ্যেতা বলে বোঝানোর একটা ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে। তবে বাস্তব বিষয়টা এমন যে, অন্তত এই সমকালে, বাঙালির বৎসরে পার্বণ পালন করার সংখ্যাটা তেরোর চেয়ে অনেক বেশি। এটা যে ক্রমবর্ধমান, সেই সত্যটা কিন্তু খুবই ইতিবাচক। ভালো থাকার পরিবেশটা, অন্তত ধীরে হলেও, না বাড়লে কোন সমাজে পার্বণ উদযাপনের মানসিকতা ও রীতি গড়ে ওঠে না। যখন এই প্রবচনটার জন্ম হয়েছিল, (সে যে কখন তা তো আমাদের জানা নেই) তখন প্রধানত ধর্মীয় উপলক্ষ অথবা প্রকৃতির ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই প্রধানত কৃষি-নির্ভর সমাজে জীবনযাপনের মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা দিত, সেটাকে মুখ্য করে তোলার তাগিদে অমন পার্বণের আয়োজন করা হত, সেকথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ধর্মভিত্তিক অথবা ঋতুভিত্তিক পালা-পার্বণের রীতিটা আজও অব্যাহত আছে, আবার একথা বলা যায়, আরও নানা রকমের উপলক্ষ আমরা খুঁজে বার করেছি, যার সূত্রে পার্বণ পালনের সংখ্যাটাও বেড়ে গেছে। এই 'পার্বণ' শব্দটা আর এই আধুনিক কালে বহুলপ্রচলিত নয়। তার বদলে এখন যে প্রতিশব্দের চলটা অনেক বেশি তা হল 'মেলা' এবং 'উৎসব'। ধর্মবিশ্বাসের কথাটা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। বাঙালি হিন্দুর শারদীয় দুর্গোৎসবের একটা সম্প্রদায়গত পরিচয় থাকলেও, একটা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের শারদোৎসবের কথা আমরা জানি। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ও ভাবনার অনুসরণে এই উৎসবের একটা ঋতুভিত্তিক আলাদা চরিত্র গড়ে উঠেছে, যা বাঙালি সমাজে একটা আলাদা তাৎপর্য অর্জন করেছে। শারদীয় উৎসব বললে বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বড় ও আনন্দের পার্বণের কথাটা প্রথমে মনে আসলেও, প্রকৃতির আচরণে ঋতুবদলের যে স্বাতন্ত্র্য এই বিশেষ সময়কালে দেখা যায়, ভরা নদী, মাটিতে কাশফুলের তারুণ্যের সঙ্গে নীলিমায় সাদা খণ্ড খণ্ড মেঘের চপলতা, মাঠের শস্যের ঐশ্বর্য থেকে হেমন্তে পাকা ফসলের আগাম ঘ্রাণ আসতে শুরু করেছে। এমন এক পূর্ণতা অভিসারী ঋতুচক্রের সন্ধিক্ষণে ধর্মীয় পার্বণ সকল বাঙালির উৎসব হয়ে ওঠে।

উৎসব আর মেলার মধ্যে পার্থক্য রচনার কিয়ৎ সত্যিকারের অবকাশ থাকলেও তাদের মধ্যে প্রীতি এবং মৈত্রীর বন্ধনটা অনেক বেশি। বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের উপলক্ষ উদযাপনের অনিঃশেষ আগ্রহে এই দুইয়ের সম্পর্ক এখন যমজের মত, প্রায়শই একটার সঙ্গে আরেকটাকে বদল করে নেয়া যায়। এই রীতিটা বিশেষ করে আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দিনের পর দিন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক কারণেই বাঙালির পার্বণের সঙ্গে গ্রাম আর কৃষির যোগটাই প্রধান। কৃষি থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য আর তৃপ্তির সংবাদটা তৈরি হত। ভাল ফসলের ফলনে জমির মালিক, বড়ো কৃষিজীবী বা মহাজনের চোখগুলো যেমন বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে, তেমনি দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালি বর্গাচাষী এবং কৃষিশ্রমিকের মুখের হাসিটাও চওড়া হয়ে ওঠে। আর ওটাই আমাদের পার্বণ পালনের মূলকথা। গ্রামীণ জীবন ক্রমে সংকুচিত হয়ে যাবার পরও অদ্যাবধি এইটাই সত্য।

কৃষিজ সুদিনের কথা ভাবলে বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের উৎসবের নাম নবান্ন। এই শব্দটার মধ্যেই সুস্পষ্ট এই উৎসবের উপলক্ষ। নতুন ধানের সঙ্গে মানুষের খাদ্যনিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য যোগ, সাধারণ মানুষের তো এর চেয়ে বড়ো কোন চাওয়া থাকতে পারে না। তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে যায় ঠিক এক মাস বা তার চেয়ে কিছু বেশিদিন আগের খাদ্যের আকাল, অভুক্ত থাকার, অনাহারে কষ্ট পাবার অভিজ্ঞতার স্মৃতি। আবার প্রকৃতির মধ্যে হিমেল আবহাওয়ার ছোঁয়া বোধ হয় মনোজগতে এক ধরনের তৃপ্তির আনুকূল্য তৈরি করে। নতুন ফসলের আলাদা রূপ ও তৃষ্ণা আছে; তা যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি বৈষয়িক দিক থেকে স্বস্তিকর। তাছাড়া নবান্নের যোগে বাঙালির যে পায়েসসহ অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের অনাদি ঐতিহ্য, তার মধ্যে সত্যিই ভিন্ন গন্ধ ও স্বাদের যোগ থাকে। পরিবারের সবাই মিলে নবান্ন উপভোগের মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে, আবার সেই আনন্দই আরও স্ফীত হয়ে ওঠে বিভিন্ন পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে তা ভাগ করে নেবার মধ্যে। হেঁটে যাওয়া পথিকও তার ভাগ পায়, পথের ভিখিরিরও যেন অধিকার আছে তাতে এবং এমনকি ঘরের পোষা পশু-পাখির সঙ্গে নবান্নের ভোগ ভাগ করে না নিলে যেন উৎসবের পূর্ণতায় কিছুটা ঘাটতি থেকে যায়।

বাঙালির উৎসবের এমন আক্ষরিক অর্থে সর্বজনীন চরিত্রটাই এটাকে পৃথক মাহাত্ম্য দান করে। হয়তবা শুধুই বাঙালির নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই জনজীবনের সঙ্গে জড়িত এধরনের উৎসবে এমন বহুব্যাপক অংশগ্রহণ বোধ হয় মানব সমাজের বৈশ্বিক এক লক্ষণ। প্রাচীন মিশরের সমাজ-ধর্মে তা ছিল, এখনো আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর প্রায় সকল আদিবাসী সমাজে উৎসব পালনের রীতির মধ্যে এই চরিত্র আবশ্যিকভাবেই লক্ষ করা যায়। এই আমাদের বাংলাদেশে যখন বিশেষভাবে বাঙালির উৎসব উদযাপনের কথা আলোচনা করছি, তখন অবধারিতভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছে যে, আমাদের পাহাড় ও সমতলে বাস করা বহুসংখ্যক আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের বিভিন্ন উৎসবের কথা। তার কয়েকটির সঙ্গে মূলধারার বাঙালির মিল তো আছেই, উপলক্ষের অভিন্ন সূত্রে এবং গোষ্ঠীজীবনে উৎসবের আনন্দ সৃজনের উৎসকথায়। যেটুকু প্রভেদ বা দূরত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, তা একান্তই স্বাভাবিক। ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতের একটা ভূমিকা তো থাকেই, তা ছাড়া ঐতিহ্যের যে পরম্পরাগত উত্তরাধিকার, তার স্বাতন্ত্র্যই জীবন এবং উৎসব উদযাপনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ধ্রুপদী বাংলা সাহিত্যে বাঙালির মেলার নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে বাংলার জনপদে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কের ধারণাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেলাতে বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে যাবার গল্প এবং তার ফলে যে মানসিক যন্ত্রণা, সে সবের বিষয় নানা গল্পের কথায় এবং বিশেষত বাংলার গ্রাম-জীবনে বেশ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শব্দযন্ত্রের প্রয়োগ ও মোবাইল ফোনের ব্যাপক সহজলভ্যতায় সে ধরনের ঘটনা আর আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ নয়। যদিও আজও মেলায় হারিয়ে যাওয়া এবং সে বিষয়ে মাইকে বার বার ঘোষণা প্রদান মেলায় আগত ব্যক্তিদের শ্রুতি আকর্ষণ করে থাকে। মেলায় হারিয়ে যাবার ব্যাপারটা আপাতভাবে চটুল মনে হলেও তা অনেক সময়ই অনেক পরিবারে চিরদিনের বিষাদ সৃষ্টি করেছে, আবার হারিয়ে যাওয়া কোন শিশুর নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবার বিষয়ও আমাদের পুলকিত করে।

মেলার সূত্রে আমাদের কৈশোরের একটা জনপ্রিয় গান আজও প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের একটু আনমনা করে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি।' স্মৃতি রোমন্থনে সত্যি মনে পড়ে যায়, নানা রকমের বাঁশির বাদন ছিল মেলার এক শাব্দিক বৈশিষ্ট্য। তালপাতার বাঁশি এবং উচ্চকিত করা ভেঁপুর সঙ্গে কোন রকমের সঙ্গীতশিক্ষায় তালিম না নেয়া কোন অভাজন বাঁশিওয়ালার প্রায় নির্ভুল সুরে কোন পুরোনো দিনের গানের সুমিষ্ট পরিবেশনা মেলায় আগত অনেককেই বিস্মিত করতো। স্মৃতির পথ হেঁটে এখনো দেখতে পাই কোন বালক ওই বাঁশিওয়ালার পসরা থেকে একটি বাঁশি নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সুর তোলার জন্য, স্বাভাবিক পটুতার অভাবে তা থেকে বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, কোন পথিক তা শুনে মুচকি হাসছেন। তারপরও দেখা গেছে, ওই জেদী বালক বাঁশির আকর্ষণ ছাড়তে পারেনি। কিনেই নিয়ে গেছে এক বাঁশি। আবার ওই কৈশোরের গানটার কথায় ফিরে যেতে চাই। মেলার সঙ্গে কি বয়সের কোন আলাদা যোগ আছে। মেলা থেকে তালপাতার যে বাঁশি কেনার কথা সঙ্গীতশিল্পী বলছেন, তার সুর ছাড়াও বাণীটা আমাদের মধ্যে আলাদাভাবে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। মেলা থেকে বাঁশি কিনে আনা হয়েছে, বোঝা যায়। আগে মানে আরও অনেক কম বয়সেও এমন বাঁশি কেনা হয়েছিল, সুর তোলা হয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন দুঃখের আবহও বেজে ওঠে। গানের বাণীতে বলা হচ্ছে, বাঁশি ওই আগের মত বাজে না, মন আমার আগের মত টানে না। মনে পড়ে, আব্দুল্লাহ আল মামুন তাঁর বিখ্যাত নাটক *কোকিলারা*-য় নায়িকার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিরতি বোঝানোর জন্য এই গানটির স্থায়ী অংশটা বার বার ব্যবহার করেছিলেন। বাঁশি আর আগের মত বাজে না কেন, সে কি বয়সের যে সন্ধিক্ষণের সঙ্গে বাঁশির সুর আর মেলায় অংশগ্রহণের কোন স্বতন্ত্র স্মৃতির যৌথতা ছিল, তার আর কোন রেশ আজ আর বেঁচে নেই এজন্য, না কি মনে হয় সেদিনের স্মৃতির সঙ্গে যে হার্দিক-মানসিক-রোমান্টিক ভাবনার

যোগ ছিল, মহাকালের পরিক্রমায় তা অনিবার্যভাবেই নিশ্চিহ্ন বা তবিত হয়ে গেছে। আরও হয়ত অন্য কোন চিন্তনের সূত্র আবিষ্কার করা যায় এই গানের এই বাণী থেকে, কিন্তু মেলা নামক যে উৎসব বা দেখাশোনা চেনাজানার উপলক্ষ তার একটা অক্ষয় যোগ মনে স্মৃতিময় প্রদাহ সৃষ্টি করে।

বাঙালির মেলার সঙ্গে, অনুমান করা যায়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এমন মেলা বা উৎসবের একটা পরম ভ্রাতৃত্বসূচক ও মৌলিক যোগ আছে। শব্দার্থের দিক থেকে মেলা কথাটির গভীর ও ব্যাপক ব্যবহারিক অন্বয় আছে। মেলা হল আমাদের মিলিত হবার একটা উপলক্ষ বা ফোরাম। মানুষে মানুষে মিলিত হবার মাধ্যমেই আমাদের সমাজের বহুমুখী বিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। সামাজিক পরিচয়, বন্ধন, মৈত্রী, নির্ভরতা এসবই গড়ে উঠেছে মানুষের মিলনের মধ্যে দিয়ে। যখন উচ্চারিত হয় 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' (যেখানে প্রায় নির্দিষ্টভাবে দ্বিবাচনিক একটা অর্থ জড়িত) অথবা 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' (যার মাধ্যমে অনেকের ভূমিকার কথা বোঝানো হয়) অথবা 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' (যে আহ্বানের মধ্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা জাতি-পরিচয়কে নির্দেশ করা হয়) এই সবের মধ্যেই মেলা ক্রিয়াপদের যে যোগ, তারই এক আনুষ্ঠানিক ও উপলক্ষভিত্তিক আয়োজন হল মেলা। বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ হিসেবে 'মেলা' খুবই সুন্দর ও প্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'মেলা' শব্দটাকে আমরা বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহার করে থাকি, সাধারণ কথা যোগাযোগের মাধ্যমে। মেলায় মিলিত হয় বহু মানুষ, তা থেকে বলি, বিয়ে বাড়িতে মেলা (ম্যালা) মানুষকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, অথবা এসব প্রয়োগ খুবই বহুল যে এখন আমার মেলা কাজ বা মেলা ঝামেলা।

শুধু 'মেলা' শব্দটি যখন ব্যবহার করি, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনের চত্বরে ভেসে ওঠে কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে বা বিশাল ভবনের খোলা জায়গায় আয়োজিত নানা পসরার বিচিত্র প্রদর্শনী। আদিকালে তা গ্রামের ভৌগোলিক চৌহদ্দির কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিত। এখনো সেই আদি অনুষঙ্গ শেষ হয়ে যায়নি। যদিও হয়ত অনেকের কাছে মেলার বাঁশি আর অমন করে বাজে না, যদিও আধুনিক কালে প্রযুক্তির সুবাদে নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোর ঝলক সেকালের গ্রামীণ সহজতাকে মুছে দিয়েছে, যদিও এখন গ্রামীণ কারিগর ও কারুশিল্পীদের উৎপাদিত পসরা এবং সামগ্রীর পরিমাণকে পিছে ফেলে বড় বা মাঝারি শিল্পপতিদের যন্ত্রজাত উৎপাদন বেশিটাই দখল করে নেয়ে মেলার চত্বর, তবু এখনো মেলা আমাদের পৃথিবীর এই অংশের মানুষের মনে ভিন্নতর এক স্মৃতিময় উত্তাপ সৃষ্টি করে। এই বাংলাদেশের একটা পরম সত্য হল যে, জাতীয়তাবাদী অনুভব ও চৈতন্যে এই দেশটার এক গর্বিত পরিচয় আমাদের আলোড়িত (বিশেষ করে আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দল যার সৃজন ও বর্ধনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে) করলেও এখনো এখানকার বাঙালি ঈদ এবং পুজো অথবা বড়দিনের উৎসব উদযাপন করতে ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে 'দেশে' যাবার উত্তেজনায় মেতে ওঠে।

গ্রামের মানুষ নানাভাবেই শহরের মানুষের কাছে হেরে যায়, দক্ষতার অভাবে, কৌশলের অভাবে, বিত্তের অভাবে। কিন্তু সংস্কৃতির নানা দ্যোতনায় এবং এই যে একটু আগে বলছিলাম যে শেকড়ের কথা, তার প্রভাবে গ্রামও নাগরিক সংস্কৃতির ভুবনটায় অনেকটা দখল প্রতিষ্ঠা করে, আর তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল মেলার আয়োজন। এখন ঢাকায়, কোলকাতায়, দিল্লীতে, ফ্রাঙ্কফূর্টে, মানুষ বই মেলার আয়োজন করে। মিলিত হবার যে আদিকথা, তার চমৎকার এক আধুনিক সাংস্কৃতিক তথা ব্যবসায়িক প্রতিফলন ঘটে এর মাধ্যমে। দেশের নানা প্রান্তের, নানা বয়সের লেখকরা মিলিত হন।

ডানপন্থী লেখক, বামপন্থী লেখক, সহজ শব্দের যাদুকরী ছড়াকার এবং পরম দুর্বোধ্য শব্দের সমাহারে সংগঠিত আধুনিক কবিতার রচয়িতা, কাল্পনিক সব লেখার লেখকের জটলার সঙ্গে একদম বাস্তবতানির্ভর হাঁড়ির খবর তুলে আনা চেনা জীবনের কাহিনীকার, চটি বই, কেজি পাঁচেক ওজনের বই, দশ টাকার বই এবং পাঁচ হাজার টাকার বই সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এমন সব বড়ো বইমেলায়। ভাষা শহীদদের স্মরণে ঢাকার

বাংলা একাডেমিতে মাসব্যাপী এই বই প্রকাশনা ও বিপণনের উৎসবকে এখন আমরা প্রাণের মেলা নাম দিয়েছি। মফঃস্বল থেকে দর্শক আসেন আগে থেকে সফরসূচি ঠিক করে, ঢাকা শহরের তরুণ-তরুণীদের দেখাশোনা আর খুনসুটি করার জন্য মাসব্যাপী একটা স্থান নিশ্চিত হয়ে যায় বইমেলার প্রাঙ্গণে। বাংলা একাডেমীর মাঠে আর এখন স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের এক অংশ দখল হয়ে গেছে। এমনভাবেই গ্রামের মেলার স্বরূপটা শহরের এলাকায় বিস্তৃত হয়ে যায়।

এমন অনেক মেলার কথা বলা যায়। কিন্তু বাংলা একাডেমির মত গমগম করা ঢাকার আর একটা মেলার কথা উল্লেখ করতে প্ররোচিত বোধ করছি। সময়ের দিক থেকে এই দু'টোর মধ্যে একটা সহোদর চরিত্র আছে। বলছি, বাণিজ্য মেলার কথা। বাণিজ্য মেলারও দিন তারিখ নির্দিষ্ট। জানুয়ারির এক তারিখে আরম্ভ হয়, চলে সারাটা মাস জুড়ে। সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ইত্যাদির সঙ্গে যেন বাণিজ্য কথাটা কেমন বেমানান শোনায়। তবুও তো এই আয়োজন মেলার স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত এই বিশেষ শব্দ 'মেলা'-র বিজয় ঘটে গেছে। আমাদের বাণিজ্য মেলার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য নানা পসরার বিক্রিবাটা। তাতে গ্রামের দা-বটি, খুন্তি, কড়াই থেকে সর্বাধুনিক আধুনিক ইলেকট্রনিক সামগ্রী মিলেমিশে থাকে। বই মেলার সঙ্গে অন্যতর কিন্তু অর্থবহ মিলটা হল এখানেও নাগরিকরা কেনাকাটা ইত্যাদির চেয়ে মেলামেশা-আড্ডা, ছুটির মেজাজ উপভোগ, বিনোদন বিষয়েই অধিক আকর্ষণ বোধ করেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই বাণিজ্য মেলার জৌলুস আর আলোকোজ্জ্বল ছটা বইমেলার চেয়ে অনেক অধিক।

বাণিজ্যের সঙ্গে যোগ অনেক বেশি এমন বিষয়ে মেলার সংখ্যা আমাদের দেশে দিন দিন বাড়ছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেশে বাজার সংস্কৃতির উত্তাপ ও প্রতাপ ক্রমবর্ধমান। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, ভোগবাদী সমাজের নানা লক্ষণ বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং জমির প্লট কেনার জন্য প্রতি বছরই আবাসন মেলার প্রচলনটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এই মেলাতেও বাঙালির অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত। ঢাকাতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একাধিক স্থানে গাড়ী বিক্রির মেলার আয়োজন এখন এক নিয়মিত বাস্তবতা।

বিগত কয়েক বছরে আর একটা বিষয় বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সবার। মেলা নামক একটা আয়োজন যে বাঙালির সংস্কৃতির সংজ্ঞা পেরিয়ে বৈষয়িকতাকেও প্রবলভাবে স্পর্শ করেছে, আবার মেলা কথাটা জুড়ে দিলে বুঝি শব্দগত আকর্ষণটাও বৃদ্ধি পায় তেমন এক দ্ব্যর্থবোধক আনুষ্ঠানিকতা চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। তাদের আয়োজনে আয়কর মেলা কর আদায়ের ক্ষেত্রে এক বিচিত্র সংযোজন। এই মেলায়ও মানুষের সাড়া এবং ভিড়ভাট্টা কম নয়। অন্যান্য মেলায় বিনোদন ও সামাজিক মেলামেশার যে টান থাকে, সেটা এখানের সামান্যতম উপাদানও নয়। আয়কর অফিসের বরফমুখো ও লোভী চোখের কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের টেবিলের সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে যে অপ্রীতিকর হেনস্তার মুখোমুখি হতে হয়, তা থেকে সত্যিই নিষ্কৃতি দেয় আয়কর মেলা । এই মেলার আকর্ষণটা যে বেড়েছে, সে এবার ভালোই বোঝা গেল। আয়োজিত হল একবারের জায়গায় দু'বার। আর তা ছাড়া ঢাকা মহানগর ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান শহরেও তার আয়োজন করা হয়েছে।

বাঙালির আধুনিক জীবনধারায় মেলা নামক মিলিত হবার উদ্যোগটার যে বিবর্তন লক্ষ করা যায়, তার সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনা নানা দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তবুও গ্রামীণ অর্থনীতি, ধর্ম ও আচার এবং প্রকৃতির কান্না-হাসির দোল-দোলানো জীবনের আনন্দ-বেদনার পালার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও ঐতিহ্য অনুযায়ী মেলার স্বতন্ত্র অবস্থান ও আবেদনের সঙ্গে সমকালের বিভিন্ন উপলক্ষের অন্বেষণকে তুলনা করা যাবে না। গ্রামের জীবনে প্রবল গতিতে নগরের অনুপ্রবেশ ঘটছে; গ্রামের যেসব বিত্তবানদের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অতীতে মেলার আয়োজন সম্পন্ন হত, তারা এখন আর গ্রামবাসী নন, তাই আদ্যিকালের মেলার বাহ্যিক যে বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য ছিল, তা যেমন কমেছে, তেমনই সেকালের মেলার অনুষ্ঠানে যে মানবিক সৌরভ ছিল, তা-ও আজ আর সেই মাত্রায় নেই। তবুও বাংলাদেশের দু'একটি অঞ্চলে এখনো রথের মেলা বসে; মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে এখনও দূর থেকে দর্শনার্থী আসে রাসমেলার আনন্দ উপভোগ করতে।

একথা সত্যি যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে আয়োজিত এমন সব মেলার সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যোগটাই ছিল মৌলিক। সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং তার পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের প্রভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী দেশত্যাগী হয়েছে। দৃষ্টিকটুভাবে কমেছে হিন্দু জনসংখ্যা, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও এই দেশান্তরী হবার প্রবণতা তেমন হ্রাস পায়নি। তা ছাড়া, পাকিস্তানী শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে ইসলামী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মেলা আয়োজনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি করা হয়। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে যে, মেলাকে উপলক্ষ করে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

আগে যেসব স্থানীয়, দেশজ বা লোকজ আবহ ছিল, তার মধ্যে এখন নানা বিকৃতি ঘটে অনেক মেলার ক্ষেত্রে; অত্যন্ত রুচিহীন সব প্রকরণে একটা অসামাজিক ও অগ্রহণযোগ্য বিনোদন সৃষ্টি করা হয়। হয়ত তার জন্য আমাদের দেশের বা প্রতিবেশী দেশের ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু সেই মধ্যযুগ থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারের কাল থেকে বাংলার জনপদে মেলা আয়োজনে তেমন কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়নি।

বিভিন্ন ইসলামী পীরের মাজারে যে বার্ষিক ওরশ আয়োজিত হয়, তা বিচার করলে বোঝা যাবে, এই রীতি মূলত ভারত উপ-মহাদেশীয়। যে সময় বাংলাদেশে পৌষ মেলা উদযাপিত হয়, যেসময় গোলায় ভরা পাকা ফসল বাঙালিকে তৃপ্তি দেয়, যেসময় পাড়াগাঁয়ের নানান জায়গায় আয়োজন করা হয় যাত্রাপালা কবিগান, যেসময় দরিদ্র মানুষও কিছুটা অর্থনৈতিক স্বস্তির স্বাদ পায়, তেমন সময়েই দেখা যায়, বিভিন্ন পীর-আউলিয়ার মাজারে ওরশের অনুষ্ঠান। ওরশেও মানুষকে মিলিত হবার আহ্বান জানানো হয়, ওরশ উপলক্ষেও গ্রামীণ উৎপাদনের পসরা সাজিয়ে বসেন ক্ষুদ্র সব উদ্যোক্তা, ঐতিহ্যবাহী মেলায় যেমন দূরদূরান্তের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের মিলনের একটা সুযোগ ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তাই ধর্মকে ভিত্তি করে মেলার আয়োজন ঘটলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে, মানুষে মানুষে যোগাযোগের মাধ্যমে মেলা এক ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অর্জন করে।

গ্রামের এই শিকড় অভিমুখী বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে এবং অন্যতর এক সংস্কার প্রক্রিয়ায় মেলা এখন শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ করেছে। গ্রামের পৌষ মেলা বা বৈশাখী মেলা অথবা নবান্ন এখন ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের অবিভাজ্য অংশ। গ্রাম শুধু শহরের সীমানায় উঁকি দিচ্ছে না, নিজেকে রূপান্তরিত করে নিচ্ছে আধুনিকতার আভরণ ও লক্ষণে। নববর্ষ উদয়াপনের যে বিশালত্ব ও বৈভব ঢাকায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, তা পৃথিবীব্যাপী এক অতুলন সাংস্কৃতিক সম্মিলনী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। মিলনের মন্ত্রটাকে অনুসরণ করে শিক্ষিত বাঙালি ষোলই ডিসেম্বর বিজয় মেলার আয়োজন করে, যেখানে রাজনৈতিক বক্তব্য, দেশের গান এবং উদ্দীপক আবৃত্তির সঙ্গে যোগ হয় কবি-গান, গম্ভীরা, লোকজ হস্তশিল্পের মেলা। বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় আয়োজিত হয় রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে রবীন্দ্রমেলা, সেখানে রবীন্দ্র-আলোচনা আর তাঁর পুস্তক প্রদর্শনীর পাশাপাশি লোকায়ত সংস্কৃতির একটা সম্প্রসারিত জায়গা থাকে। প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান যশোরের সাগরদাঁড়িতে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় মধুমেলা, সেখানেও দেখা যাবে গ্রামীণ পণ্যের অস্থায়ী দোকান, শোনা যাবে বাউল গানের সুর। বাঙালি তার অতীত ঐতিহ্যের মেলাকে এভাবে কালান্তরের বিবর্তনে অক্ষয়-অমর করে তুলেছে।

শর্বরী আলোময়ী

লেখক ও শিক্ষক

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মৌলবাদের বিরুদ্ধে এনজিওগুলোর ভূমিকা রাখতে হবে

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিওগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে। জনগণের মানবিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়েও তাদের সম্পৃক্ত হতে হবে। শনিবার খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নবলোকের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈশ্বিক উষ্ণতার হার বজায় থাকলে আগামীতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং প্রায় ৩ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে। পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় এনজিওগুলোকে জনগণকে সচেতন ও তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে সংগঠিত করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন নয়, এনজিও'কে পরস্পরের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবলোকের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ হোসেন বাচ্চু। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আনিছুর রহমান বিশ্বাস, ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য হাফিজুর রহমান ভুঁইয়া এবং প্রেসক্লাবের সভাপতি মকবুল হোসেন মিন্টু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবলোকের নির্বাহী প্রধান কাজী ওয়াহিদুজ্জামান।

সমকাল ০৬.১২.২০১৫

সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন চা শ্রমিকরা

সিলেট শহরতলির খাদিমপাড়ায় হজরত শাহজালাল (রহ.) ডিগ্রি কলেজে পড়েন সঞ্চারী নায়েক। বাবা কাজ করেন সিলেট সদর উপজেলার বুরজান চা বাগানে। সঞ্চারীরা চার ভাইবোন। অভাবের কারণে ভাইদের পড়াশোনা হয়নি; কিন্তু দুই বোন পড়ালেখা করছে।

সঞ্চারী জানায়, অনেক কষ্টে তাকে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে হচ্ছে। কারণ, বাগানে ট্রাক্টর চালিয়ে তার বাবা যা আয় করেন তাতে সংসার চলে না। পড়ার খরচ চালাতে তাই তাকে বাড়তি কাজ করতে হয়।

সঞ্চারীর মতো কষ্ট করে লেখাপড়া করছে সীমা দাশ। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাই বিকাশ রঞ্জন দাশ তার লেখাপড়ার খরচ দিচ্ছেন। বিকাশ চা বাগানের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার আয়ে কোনোরকম সংসার চলে। বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

বুরুজান চা বাগানের শ্রমিকরা জানান, সঞ্চারী-সীমা পারলেও অভাবের কারণে সেখানকার বেশিরভাগ শিশু প্রাথমিকের গণ্ডি পার হতে পারে না। সিলেট ইউনিভার্সিটি টি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু কুর্মী মনে করেন, চা শ্রমিকদের সন্তানরা আসলে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শহরের আশপাশের চা বাগানের শিশুরা লেখাপড়ার কিছু সুযোগ পেলেও প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলের শিশুরা একদমই সে সুযোগ পায় না। রাজু কুর্মী বলেন, 'শিক্ষা অর্জন চা শ্রমিকের সন্তানদের কাছে যেন যুদ্ধজয়।'

এই বাস্তবতায় সমাজের অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনায় চা বাগানগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছে ওয়াটার এইড বাংলাদেশ। 'ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাফেয়ার্স' (আইডিয়া)-এর সহায়তায় সিলেট সদর উপজেলার চা বাগানগুলোতে শিখন কেন্দ্র স্থাপন করেছে ওয়াটার এইড।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সিলেট ভ্যালির সভাপতি রাজু গোয়ালা বলেন, আর্থিক অনটনই তাদের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে বড় বাধা। মূলত এ কারণেই প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনোর পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, সরকার বই দিলেও খাতা-কলম ও পোশাক কেনার সামর্থ্য অনেক চা শ্রমিকের নেই। সিলেট সদর উপজেলার টুকেরবাজারে চা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করেন আইডিয়ার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার রোজিনা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমরা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের মধ্যে লেখাপড়ার গুরুত্ব তুলে ধরছি। এতে ভালো ফলও মিলছে। কষ্ট হলেও অনেকে তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

সমকাল ০৯.১২.২০১৫

স্কুল ব্যাংকিংয়ের জন্য পুরস্কৃত বাংলাদেশ

চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই) প্রদত্ত 'চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড ২০১৫' অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বিশেষ করে শিশুদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং স্কুল ব্যাংকিংয়ে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বাংলাদেশ পেছনে ফেলেছে ভারত ও ফিজিকে। আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অবদান রাখায় গত বছর এ অঞ্চল থেকে সিঙ্গাপুরকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে আরো জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় লন্ডনে হাউস অব লর্ডসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও হাউস অব লর্ডসের সদস্য ব্যারোনেস হাওয়ার্থ অব ব্রেকল্যান্ডের কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুর রহিম।

চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল ইউরোপের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠান, যারা সারা বিশ্বে ১২৫টি দেশে তিন কোটি ৬০ লাখ শিশু ও যুবককে নিয়ে কাজ করে। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা বৃহৎ পরিসরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, সরকারি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সুধীসমাজের সংগঠনকে পুরস্কৃত করে থাকে।

হাউস অব লর্ডসে পুরস্কার প্রদানের সময় লেডি হাওয়ার্থ স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ শিশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থায় নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে এখন রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। বহুমাত্রিক উদ্ভাবনীমূলক কৌশল গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচিকে বিপুলভাবে সার্থক করেছে। এমনকি পথশিশুদেরও এ কর্মসূচিতে সংযুক্ত করেছে।

পুরস্কার অর্জনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান বলেন, এটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেকটি মাইলফলক অর্জন, যা বাংলাদেশকে 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তির রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত করবে। তিনি আরো বলেন, 'এই পুরস্কার আমাদের উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ধারণায় নতুন দিগন্তের

উন্মোচন করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্পে যেমনটি উল্লেখ করা আছে সেই ধারার ব্যাপকভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'

কালের কণ্ঠ ১২.১২.২০১৫

গ্রামের ৭৫ ভাগ শিশু এখনও চক্ষু চিকিৎসা বঞ্চিত

গ্রাম পর্যায়ে মানুষ বেশি চক্ষু সমস্যায় ভোগেন। গ্রামের ৭৫ শতাংশ শিশু এখনও চক্ষু সেবা থেকে বঞ্চিত। এই শিশুদের চক্ষু রোগ দ্রুত শনাক্ত করা গেলে অনেকাংশেই নিরাময় করা সম্ভব। এর একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষক ও পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ।

চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ম্যানেজিং ট্রাস্টি অধ্যাপক বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রবিউল হোসেন রবিবার দুপুরে হাসপাতালটির ইমরান সেমিনার হলে 'বিগত দিনের কর্মকান্ড ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল 'ভিশন সেন্টার' প্রকল্প চালু করেছে। আটটি স্যাটেলাইট হাসপাতালেও এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম্য চিকিৎসক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে শিক্ষক ও গ্রাম্য চিকিৎসকরা সহজ কিছু রোগ শনাক্ত করে শিশুদের হাসপাতালে পাঠাতে পারেন। ইতোমধ্যে দুটি উপজেলায় এটি ছড়িয়ে দেয়া হবে। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের একটি দল চাকরি ছেড়ে দেশের বাইরে চলে যাওয়ায় সেবায় ব্যাঘাত ঘটেছে কিনা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডাঃ রবিউল বলেন, ডাক্তার আসবেন, যাবেন। ইউরোপেও এ সমস্যা আছে। তবে সিনিয়র ডাক্তার ধরে রাখতে না পারা একটি সমস্যা। এটি শুরু হয়েছিল আমেরিকায়। প্রাইভেটাজাইজেশনের কারণেই এটি হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডাঃ মুনির আহমেদ, ডাঃ রাজিব হোসেন ও অধ্যাপক ডাঃ মুনিরুজ্জামান ওসমানী।

জনকণ্ঠ ১৪.১২.২০১৫

শিক্ষকদের নিষ্ঠাবান হতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষকদের সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পাশাপাশি বাজেট স্বল্পতার কারণে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রত্যাশিত মাত্রায় না বাড়াতে পারায় তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় বাজেট কম, ঋণ পরিশোধ করতে ১২ শতাংশ চলে যায়। শিক্ষায় ভবিষ্যতের জন্য আমরা তাই মাত্র ১০ শতাংশ বিনিয়োগ করছি।

রোববার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষকদের জন্য 'ওয়েব বেইজড টিচিং অ্যান্ড লার্নিং সিস্টেমস' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের ১ টাকা নিয়ে ২ টাকার কাজ করার মানসিকতায় কাজ করতে হবে। এ মানসিকতার কারণেই এক সময় যারা শিক্ষকদের সঠিক সম্মান দেয়নি, তারা পরবর্তী সময়ে ভাবছে কেন আমরা শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন করিনি। কারিগরি শিক্ষা প্রসারে সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় যুক্ত হবে।

৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এ এস মাহমুদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক অশোক কুমার, কলম্বো প্লান স্টাফ কলেজের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. কুলানথাইভেল।

আলোকিত বাংলাদেশ ১৪.১২.২০১৫

প্রতি আসনের জন্য ৭ পরীক্ষার্থী

ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত ৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির জন্য প্রতি একটি আসনে সাতজনের বেশি শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ১০ হাজার ২৩৭ টি আসনের বিপরীতে আবেদন ফরম জমা পড়েছে ৭৫ হাজার ৭০৬টি।

গত রোববার রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে আবেদন গ্রহণের শেষ সময় হলেও গতকাল সোমবার আবেদনের মোট তথ্য পেয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর।

এবারও ৩৫টি বিদ্যালয়কে তিনটি গুচ্ছ করে প্রথম শ্রেণিতে লটারি এবং দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির পরীক্ষা হবে।

অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এ' গুচ্ছের বিদ্যালয়গুলোর ৩ হাজার ৮২৮টি আসনের বিপরীতে আবেদন ফরম জমা পড়েছে ২৫ হাজার ৪৬৪টি। 'বি' গুচ্ছের বিদ্যালয়গুলোর ৩ হাজার ১০৪টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ২৬ হাজার ৯৭৬টি এবং 'সি' গুচ্ছের বিদ্যালয়গুলোর ৩ হাজার ৩০৫টি আসনের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ২৩ হাজার ২৬৬টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির লটারি হবে ২৬ ডিসেম্বর। আর দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির পরীক্ষা হবে যথাক্রমে 'এ' গুচ্ছের ১৭ ডিসেম্বর, 'বি' গুচ্ছের ১৮ ডিসেম্বর ও 'সি' গুচ্ছের ১৯ ডিসেম্বর।

অন্যদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর ছাড়া অন্যান্য জেলার সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ৩৬ হাজার ৬১৪টি আসনের বিপরীতে ফরম বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৫০২টি।

ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা সদরের (চট্টগ্রাম মহনগর ছাড়া) ১৭৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবার অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়।

প্রথম আলো ১৫.১২.২০১৫

দেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে ৫৮.৬ শতাংশ

দেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ৭ বছরের উপরে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশে। তা ২০১৩ সালে ছিল ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ। তা ২০১৩ সালে ছিল ৫৯ দশমিক ৩ শতাংশ। নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার বেড়ে হয়েছে ৫৬ দশমিক ৬ শাংশ। তা ২০১৩ সালে ছিল ৫৫ দশমিক ১ শতাংশ।

এদিকে বয়স্ক শিক্ষার হারও বেড়েছে। ২০১০ সালে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিল ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬১ দশমিক ৪ শতাংশে।

জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় শহরের লোকজন প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি শিক্ষিত।

আমাদের সময় ২১.১২.২০১৫

‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা’ নিশ্চিতকরণে প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ধারণাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮ ডিসেম্বর উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটে উদয়ন-বাংলাদেশ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ‘প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও যত্ন : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা। শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সংশ্লিষ্ট এনজিও, সরকারি বিভাগের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ মোট ৯০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব আসাদুজ্জামান শেখ, নির্বাহী পরিচালক, উদয়ন বাংলাদেশ, বাগেরহাট। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ভয়েস অফ সাউথ বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এডভোকেট মীর শওকাত আলী বাদশা, সংসদ সদস্য, সভাপতি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে আরও সচেতনতাধর্মী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

বিশেষ আলোচক জনাব অশোক কুমার সমাদ্দার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বাগেটহাট বলেন, প্রতিটি শিশুর প্রতি আমাদের ইতিবাচক আচরণ করা প্রয়োজন। সভার সভাপতি জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, উদয়ন-বাংলাদেশ ও গণসাক্ষরতা অভিযান

যৌথভাবে প্রকাশিত প্রাক-শৈশব শিক্ষা ও যত্ন বিষয়ে সচেতনতাধর্মী একটি পোষ্টারও মতবিনিময় সভায় বিতরণ করা হয়।

মিজানুর রহমান আকন্দ

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট- ২০১৫ প্রকাশনা উৎসব

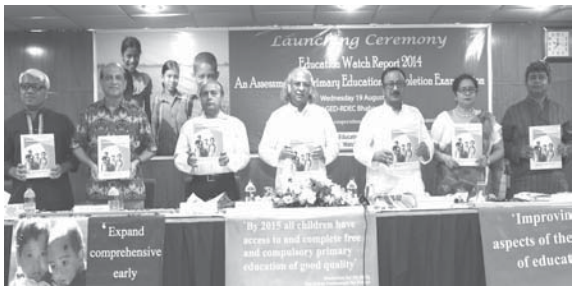

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এডুকেশন ওয়াচ-এর যৌথ উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার এলজিইডি মিলনায়তনে Moving from MDG to SDG: Accelerate Progress for Quality Primary Education (সহস্রাব্দ উন্নয়ন থেকে টেকসই ভবিষ্যৎ: প্রয়োজন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির গতিবৃদ্ধি) শীর্ষক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট-২০১৫-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টের -এর ১৪তম (২০১৫) গবেষণা। প্রকাশনা উৎসবের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন গণসাক্ষরতা অভিযান ও এডুকেশন ওয়াচের সদস্য সচিব, রাশেদা কে. চৌধূরী। এডুকেশন ওয়াচের ২০১৫ সমীক্ষার ফাইন্ডিংস্ নীতি সংক্রান্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন এডুকেশন ওয়াচ সমীক্ষার ২০১৫-এর প্রধান গবেষক, সমীর রঞ্জন নাথ। এছাড়া অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও, নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক সংস্থা, শিক্ষক সংগঠন, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি অন্যান্য গ্রুপ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থা-র প্রতিনিধি সহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও ছিল অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক। প্রকাশনা উৎসবের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা যে এগিয়ে যাচ্ছে এ প্রতিবেদনে তারই প্রতিফলন দেখা গেছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বর্তমানে লক্ষ করা যাচ্ছে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলায় পিছিয়ে পড়ছে। এটা মোটেও সুখকর কোন নির্দেশক নয়। আমরা গণিত, ইংরেজী, বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিতে গিয়ে বাংলায় পিছিয়ে পড়ছি। বিশেষ অতিথি ইউ.এন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি-এর সদস্য ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ডিএফআইডি বাংলাদেশের টীম লিডার (স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) ড. কেরোলিন সানার্স, বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি উদাহরণ।

জয়া সরকার

উপানুষ্ঠানিক স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গণসাক্ষরতা অভিযান ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। সারাদেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে মোট ২৩ জন প্রতিনিধি এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন গোলাম মেজবাহ্ উদ্দিন, পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ১০ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে একদিন মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষা, সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগ্যতা কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপনী অধিবেশনে অতিথি ছিলেন কে.এম.

আবদুস সালাম, যুগ্ম সচিব এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৫২ টি এনজিও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। একইসাথে তিনি সরকারের নতুন পদক্ষেপ শুদ্ধাচার কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণে কোর্সে আ. ন. স. হাবীবুর রহমান, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, এবিএম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, মনসুর হাসান খন্দকার, অধ্যক্ষ, এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ, এম এ এস কাউসার সরকার, ডেপুটি কন্ট্রোলার কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বেগম নীলুফার, জেন্ডার কলসালটেন্ট, হাবিবুর রহমান, প্রশিক্ষক, সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

উর্মিলা সরকার

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে চাই শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ

২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ড গ্র্যান্ড হলে "প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। মূল আলোচক ড. মনজুর আহমেদ বলেন, "বাংলাদেশের সংবিধানে সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা করা থাকলেও আমরা এখনো সকল ক্ষেত্রে সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে পারিনি"। প্রধান অতিথি ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন "সত্যিকার অর্থেই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই"। তিনি আরও বলেন, "গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অবহিত আছে এবং তাদের যে কোন প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।" পরিশেষে গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'সভার সুপারিশসমূহ আমরা আরও উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরব এবং সকলে মিলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাব'।

মোঃ মেহেদী হাসান

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়-দায়িত্ব বিষয়ক মতবিনিময় সভা

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ :বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়-দায়িত্ব বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক, জনাব তপন কুমার দাশ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং পরবর্তী কালে বিদ্যালয়ের জন্য আরও বেশি বেশি উদ্যোগী হবার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়াও সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কর্ম-এলাকায় কিছু বদলে যাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মোঃ মেহেদী হাসান

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : নাগরিক সমাজের অভিমত বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সমকাল-এর যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক '*বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়* : নাগরিক সমাজের অভিমত' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়* বইটির বিষয় বিন্যাস পরিবর্তন এবং মান উন্নয়নে নাগরিক সমাজের অভিমত তুলে ধরা ও বর্তমান চাহিদার আলোকে বইটির মান উন্নয়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সুপারিশ প্রদানই গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন এমপি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মমতাজ লতিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ শিকদার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) ড. সরকার আবদুল মান্নান, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ এবং সমকাল-এর সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত। মূল বক্তব্য ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ।

মির্জা মোঃ দেলোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার নিশ্চয়তাকরণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদঃ ১০

কেউ অপরাধী বলে অভিযুক্ত হলে তিনি তার উত্তরাধিকার এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্যে বিচারের দাবি করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১১

প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৪

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তিদান করা।

অনুচ্ছেদঃ ১৫

কাউকে নির্যাতন করা যাবে না বা অমানবিক যন্ত্রণা বা সাজা দেওয়া যাবে না অথবা কারো উপর মানবেতর অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ১৯(১)

সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩২

আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ৩৪

সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৬

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে বাংলাদেশে সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৫৯ পৌষ ১৪২২ ডিসেম্বর ২০১৫

বিজয় দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

বছরের হিসেবটা আমরা নানাভাবে করে থাকি। খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডারের এক বিশ্বব্যাপী দাপুটে আধিপত্য আছে। তা স্বীকার করেও কিন্তু আমরা এদেশে পহেলা বৈশাখ পালনের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষকে অভিবাদন জানাই। দিনের পর দিন আমাদের এমন উদযাপনের ঘটা বাড়ছে। এ এক অনাদিকালের ঐতিহ্য আমাদের, আজও অবশ্য গ্রামাঞ্চলে এর চলটা বেশ আছে, বিভিন্ন পুজো-পার্বণে তো বটেই। সামাজিক অনুষ্ঠানে হিজরি সালকে অতটা মান্য করা না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের প্রধান সব উৎসব আর ধর্ম পালনে তার উপস্থিতিটা প্রতিনিয়তই টের পাওয়া যায়।

এছাড়া আছে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে স্থির করা সাক্ষরতা দিবস, শিক্ষক দিবস, মানবাধিকার দিবস, আদিবাসী দিবস। তখনও আমরা একটা বার্ষিক হিসেব-নিকেশের অনুশীলন করে থাকি। মেলাতে থাকি আমাদের পাওয়া-না-পাওয়া, অর্জন আর হতাশার অঙ্ক। জাতি হিসেবে আমাদের জন্য কিছু কিছু দিবসের আলাদা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। সেই পাকিস্তানী আমল থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করার সময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে নানা সভা-সমাবেশে। ১৯৭২ সাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের আবর্তনে ছাব্বিশে মার্চ এবং ষোলই ডিসেম্বর যথাক্রমে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপনের এক অনিবার্য, আনন্দময়, স্মৃতিময় ও গৌরবময় রীতি গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব, পরাধীনতার শেকলমুক্ত হয়ে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতির বহুমুখী সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে কিভাবে দেশের আর্থসামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি করা যায়, কিভাবে লাখো শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায়, কিভাবে বিশ্বসভায় আমাদের আসনকে উজ্জ্বলতর করা যায়, এমন সব অতিকায় ও প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কতটা পথ পাড়ি দেয়া গেল, তেমন সব হিসেব-নিকেশের কথা যুক্তিসঙ্গতভাবেই উঠে আসে এই মহান দুই দিবস পালনের কালে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে উদারপন্থী, গণতান্ত্রিক ও শোষণের অবসানমুখী সমাজ বিনির্মাণের বিপুল দায়ভার বর্তেছে আমাদের ওপর, তার জন্য বিগত বছরে কতটা সামর্থ্য প্রদর্শন করেছি আমরা, তার বিশ্লেষণ করি বিজয় দিবস উদযাপনের আগে-পরে। অর্জনের পাল্লাটা নেহাত কম ভারী নয়, কিন্তু একথাও ঠিক যে, অনেক হতাশা, অবক্ষয় এবং ক্লান্তিকর গ্লানির ভারটাও বেশ দুর্বহ।

দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি বিজয় দিবসের পালনের কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংগ্রামী ইতিহাসের কথা বলে না, বিদেশী বন্ধুদের সহায়তার কথা বলে না, স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবহেলার কথা বলে না, স্বাধীনতার ইতিহাস কিভাবে কলঙ্কিত হচ্ছে সেসব কথা বলে না। তারা পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে একে অন্যের আচরণের নিন্দার মধ্যেই এমন গৌরবময় বিজয় দিবসের উদযাপনকে বন্দী করে রাখে। জাতি কিন্তু তাদের কাছ থেকে আরও অনেক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশা করে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭ ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org